সত্যের জয় হলো (১)

ইলিয়াছ রিফাঈ

আল ইসলাম প্রকাশনী
(দারুল ইসলাম)
বাংলাবাজার, ঢাকা

সত্যের জয় হলো (১)

ইলিয়াছ রিফাঈ

প্রকাশকঃ
আল ইসলাম প্রকাশনী (দারুল ইসলাম)
বাংলাবাজার, ঢাকা

সর্বস্বত্বঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
রবিউস সানি,২৮/৪/১৪৩৯ হিজরি
জানোয়ারি, ১৫/০১/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

হাদিয়াঃ১২০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র

যোগাযোগঃ ০১৯৪১-৩৯৮৪৭০,০১৭৯৩-৩২৮৪৮৯

লেখকের সঙ্গে যোগাযোগঃ
E-mail: spistr1777@gmail.com

কুরআনের বাণী

‘তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ হতে হত তবে এর মধ্যে বহু অসঙ্গতি পেত।’

সুরা নিসা, ৪/৮২।

আমি আমার নিদর্শনাবলি তাদেরকে দেখাব বিশ্বজগতেও এবং খোদ তাদের অস্তিত্বের ভেতরেও, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটাই সত্য।

সুরা হা-মিম সাজদা, ৪১/৫৩।

সূচিপত্র

বিজ্ঞানকে ধর্মগ্রন্থ থেকে পবিত্র রাখুন! /৫
‘অবৈজ্ঞানিক’ নাকি ‘বিজ্ঞানের অনুপস্থিতি’/১৩
দা ব্রেইন ইন দা হার্ট/২৩
মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়কাল৩১/
পাহাড়: পৃথিবীর পেরেক/৩৫
মহাবিশ্বে ধোঁয়া/৪৩
সমুদ্র গর্ভে ঢেউ/৫৯
আঁধারে ঢাকা সূর্য/৬৫
ভ্রূণ সৃষ্টিতত্ত্ব ও আধুনিক বিজ্ঞান/৭৩
ইসলামের ছায়াতলে অমুসলিম বিজ্ঞানী/৮৫

বিজ্ঞানকে ধর্মগ্রন্থ থেকে পবিত্র রাখুন!

ইসলাম বিদ্বেষী যেলোক যেক্ষেত্রেই কাজ করে, সে-ই আওয়াজ তোলে অমুক ক্ষেত্র থেকে ইসলাম ও কুরআনকে দূরে রাখুন। ইসলামি খিলাফত বিদ্বেষীরা বলে, রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পবিত্র রাখুন। নাস্তিকেরা যখন 'কুরআন মাজিদের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা'র নাম শুনে তখন তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বলে, বিজ্ঞানকে ধর্মগ্রন্থ থেকে পবিত্র রাখুন। ওরা বলে, 'পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা' ধার্মিকদের ধোকা ও চালবাজি। মূলত বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের কোন সম্পর্ক নেই। এতদিন কোথায় ছিল তোমাদের 'কুরআন ও বিজ্ঞান'? যখন দেখল বর্তমানে বিজ্ঞান ছাড়া কুরআন চলে না তখন বিজ্ঞানকে কুরআনের ওপর চাপিয়ে দেয়া শুরু হল! এদের এই আপত্তির উত্তর নিয়ে ইউশা উপস্থিত এই অধ্যায়ে।

ইউশা। বিজ্ঞানমনস্ক ছাত্র। এরিস্টটল থেকে শুরু করে আজকের হকিং পর্যন্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের জীবনচরিত তার স্মৃতিপটে ভাস্মর। কোন বিজ্ঞানী কোন গবেষণাকর্মের কারণে বিখ্যাত, অনর্গল বলে যায়। বর্তমান বিজ্ঞান গবেষণাসংস্থাগুলোর ওয়েবসাইটে শিকারী দৃষ্টি রাখে সব সময়।

একবার সে চট্রগাম যাচ্ছিল তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিমন্ত্রণে। রেলপথ দীর্ঘ পথ। তাই পথযাত্রায় পড়ার জন্যে সঙ্গে বই নিয়েছিল কিছু। পাশের এক যুবক, বসন-ভূষণে কবি কবি। সে দেখল, ইউশা আনমনে একটি বই পড়ছে। নাম the quran and the bible and science (কুরআন, বাইবেল ও বিজ্ঞান)। নামটা দেখামাত্র সে হুহু করে হাসল। হাসির শব্দে অধ্যয়নমগ্নতা ভেঙে গেল ইউশার। জিজ্ঞেস করল,

ভাই, নাম কি?

রাসেল।

কী করছেন?

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি, সাইন্স নিয়ে।

চমৎকার।

হাসলেন কেন হঠাৎ করে?

তোমার হাতের বইটি দেখে।

হাসার কী আছে এতে? পবিত্র কুরআনে সেই চৌদ্দশ বছর আগে বিশ্ব সম্পর্কে এমন সব তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে, যা মানুষ জানতে পারছে অধুনা।

কুরআন আবির্ভূত হয়েছে সেই চৌদ্দশ’ বছর আগে। বিশ শতকের আগে ‘কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা’ বলতে কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু যখন বিজ্ঞান মহাবিশ্ব নিয়ে বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করা শুরু করেছে তখন থেকেই সূচনা হয় এই মতবাদটির। কুরআনের ওপর বৈজ্ঞানিক থিওরি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে; বাস্তবে কুরআনে বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা বলতে কিছু নেই। যদি থাকত তা হলে চৌদ্দশ’ বছর পর্যন্ত কোথায় ছিল বিষয়টি? কুরআনে যদি বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য থেকে থাকে তা হলে আধুনিক বিজ্ঞান

বিষয়টি আবিষ্কার করার আগে কেন প্রচার করা হল না অমুক বিষয়ে কুরআন এমন কথা বলছে?

তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই, মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে, এ তথ্যটি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানীরা জানতে পারল কবে? বলল ইউশা।

উনিশ শতকে।

আচ্ছা, যেদিন বিজ্ঞানীরা জানতে পারল মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, সেদিনই কি পৃথিবীর সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে, না সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে মহাবিশ্বের সূচনা থেকেই?

মহাবিশ্বের সূচনা থেকেই। উত্তর দেয় রাসেল।

আমি যদি বলি, না। এটা বিজ্ঞানীদের বানানো কথা। সম্প্রসারণ বলতে কিছুই নেই। যদি থাকত তা হলে আদিকাল থেকেই বিজ্ঞানীরা জানত—পৃথিবী সম্প্রসারণশীল। যেহেতু তারা জানত না, তাই পৃথিবী সম্প্রসারণশীল নয়।

না। না। পৃথিবী অবশ্যই সম্প্রসারণশীল, সূচনা থেকেই। কিন্তু আদিকালের বিজ্ঞানীরা তা জানতো না, কারণ তাদের জানার কোন মাধ্যম ছিল না। পক্ষান্তরে বর্তমানে যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছে মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল। বলল রাসেল।

তা হলে কী জানতে পারলাম আমরা? জানতে পারলাম, মহাবিশ্বে সম্প্রসারণ ঘটছে অনেক আগ থেকেই। কিন্তু তা জানা গেছে কয়েকদিন আগে। কারণ আগে জানার মাধ্যম ছিল না। আর এখন আছে। এবার আসুন কুরআন মাজিদ প্রসঙ্গে। পবিত্র কুরআনে আছে, 'পৃথিবী এবং মহাকাশ মিলিত ছিল। পরে আল্লাহ এসবের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালেন।' পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আছে, 'আর আমি 'সামা' সৃষ্টি করেছি এবং আমি তা প্রসারিত করছি।'

কুরআন কারিমে আছে, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা, পৃথিবী এবং 'সামা' পুঞ্জীভূত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কথা। এই কথা আছে কোথায়? কুরআনে। আগের যুগে কারও জানা ছিল না মহাবিশ্ব ছড়িয়ে পড়ার, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা। তারা মনে করত মহাবিশ্ব যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি ছিল; সবকিছু আলাদা এবং প্রতিটি জিনিস আপন স্থানে স্থির। তো

আগের যুগে কুরঅন ব্যাখ্যাতাদের যেহেতু এ বাস্তবতা জানা ছিল না, তাই কুরআনের এমন ব্যাখ্যা তারা করতে পারেনি। কেন পারেনি? এসব তথ্য কুরআন মাজিদে নেই, নাকি তারা এসব তথ্য জানতই না? কুরআনে না থাকার কারণে নয় বরং তাদের না জানার কারণে। বর্তমানে যেসব মুসলিম গবেষক মহাবিশ্ব নিয়ে জানেন। বোঝেন। তাদের কাছে এসব পরিষ্কার। তারা মনে করেছেন, হ্যাঁ, যেহেতু বাস্তবতা হল, মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল, আর কুরআনে আছে 'আমি মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ করি।' সেহেতু কুরআনের এই সম্প্রসারণের অর্থ তা-ই যা বলছে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত মতবাদ—মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আচ্ছা রাসেল, এই যে চাঁদ-সূর্যের আলো; এই আলোর মধ্যে পার্থক্য আছে?

অফকোর্স। মডার্ন সাইন্স তা-ই বলছে।

কিন্তু আগের মানুষ কী মনে করত? তারা মনে করত, চাঁদের আলো এবং সূর্যের আলোর ধরণে পার্থক্য নেই। পার্থক্য হল, চাঁদ ছোট। আর সূর্য বড়। বর্তমান বাইবেল যারা লিখেছে, তারা যেহেতু সাধারণ মানুষ ছিল আর তাদের ধারণাও অন্যদের মতই ছিল। সেহেতু বাইবেলেও এই ভুল ধারণাটা চলে আসে। বাইবেলের জেনাসিস পুস্তকের ১ নং অধ্যায়ের ১৬ নং পদে আছে 'আল্লাহ দুটা বড় আলো তৈরি করলেন। তাদের মধ্যে বড়টিকে দিনের ওপর রাজত্ব করবার জন্য, আর ছোটটিকে রাতের ওপর রাজত্ব করবার জন্য তৈরি করলেন। তা ছাড়া তিনি তারাও তৈরি করলেন।' এই যে 'ছোট আলো' আর 'বড় আলো' এটা নির্দেশ করছে একই আলোর দিকে, পার্থক্য শুধু একটা ছোট আর অপরটা বড়।

পক্ষান্তরে কুরআন মাজিদে যেখানেই চাঁদ সূর্যের আলোচনা এসেছে। সেখানেই চাঁদ সূর্যের আলোর ভিন্নতা নির্দেশ করা হয়েছে। সূর্যকে বলা হচ্ছে বাতি —প্রজ্বলিত বাতি। পক্ষান্তরে চাঁদকে বলা হচ্ছে আলো। এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়, সূর্যের আছে নিজস্ব আলো—আগুন; দাউদাউ করা আগুন। পক্ষান্তরে চাঁদ বাতি নয়। তাই এর আগুন নেই—এর দূর বহুদূর আলোকিত করার মত নিজস্ব আলো নেই। কিন্তু আলো আছে অবশ্যই।

নিজস্ব আলো না থাকলে কোন জিনিস আলোকিত হবার এবং আলোকিত করবার একটাই আলো–প্রতিবিম্বিত আলো।

কিন্তু আগের যুগে যারা কুরআন ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের যেহেতু চাঁদ-সূর্যের আলোর পার্থক্যটা জানা ছিল না, সেহেতু তারা এই ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তার মানে এই নয়, কুরআন মাজিদ চাঁদ-সূর্যের আলোচ্য পার্থক্যের প্রতি নির্দেশ করেনি। করেছে। অবশ্যই করেছে। কিন্তু আবিষ্কার করার যোগ্যতার অভাব ছিল। বর্তমানে যারা জেনেছেন। তাদের কাছে কুরআনের এই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়েছে এবং তারা কুরআনের অলৌকিকতা দেখে অভিভূত হয়েছে।

পাশের আসনের লোকেরা দস্তুরমত শ্রোতা হয়ে ইউশা আর রাসেলের আলাপচারিতা উপভোগ করছিল। উৎসুক দৃষ্টিতে বারবার ইউশার দিকে তাকাচ্ছিল তাদের একজন। ইউশা অপেক্ষায় ছিল, রাসেল পুনরায় কোন প্রশ্ন করে কিনা। ঠিক তখনি সেই লোকটি ছুঁড়ে দিল একটি প্রশ্ন–ভাই, এটা খুবই হাস্যকর, রাশিয়া-ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞানীরা কোন কিছু আবিষ্কার করার পর বলা হয় তা কুরআনে আছে। তাদের আবিষ্কারের আগে কেন বলা হয় না কুরআনে অমুকটা আছে?

যেই আবিষ্কার করুক; রাশিয়া করুক, ইউরোপ করুক আর আমেরিকাই করুক। আবিষ্কৃত হওয়াই হচ্ছে লক্ষণীয় বিষয় কে করছে তা নয়। ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা পারছে, কারণ তাদের গবেষণার সুযোগ আছে। একসময় ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা জানত না যেহেতু তাদের সুযোগ-সক্ষমতা ছিল না। তার মানে এ নয়, যেসময় তারা জানত না, সেসময় কোন 'সুপ্ত প্রতিভা' তাদের মধ্যে ছিল না। অনুরূপ আগের যুগে মুসলমানদের সুযোগ ছিল তাই তারা জানতে পেরেছে। আবিষ্কার করতে পেরেছে। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের সুযোগ নেই তাই তারা পারে না। এর অর্থ এ নয়, মুসলমানদের মধ্যে নেই কোন 'সুপ্ত প্রতিভা' ।

তো কোন বিষয়ে কিছু বলতে হলে সেবিষয়ে জানা থাকতে হয়। যেলোক যেবিষয়ের ব্যাখ্যা দেবেন–কুরআনের, সেবিষয়ে তার জানা থাকতে হবে। সুতরাং কুরআন মাজিদের বৈশ্বিক বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে বিশ্ব সম্পর্কে জানা থাকতে হয়। জানা না থাকলে সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয়ে

ওঠে না। বর্তমানে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাতারা কুরআনের বৈশ্বিক বক্তব্যের ব্যাখা দিতে পারছেন, কারণ তারা বিশ্ব সম্পর্কে জানছেন। তথ্যউপাত্ত ইউরোপীয়দের থেকে জানাটা দোষণীয় কিছু নয়।

ইউশা কথা বলা শেষ করল মাত্র, রাসেল বলে উঠল, আপনার নাম্বারটা দিন।

কীসের নাম্বার, সিট নাম্বার, বাসার নাম্বার, না... ইউশার সহাস্য প্রশ্ন।

আরে না তো, আপনার মোবাইল নাম্বার। আমার গন্তব্য চলে এসেছে। এক্ষুণি নামতে হবে। আপনার সঙ্গে কথা আছে, মোবাইলে যোগাযোগ করব।

ইউশা জানালা দিয়ে বাইরে গাছগাছালির সৌন্দর্য, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের সবুজ দৃশ্য উপভোগ করছিল। চলন্ত যানে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে বেশ চমৎকার লাগে তার। কেমন যেন সে বসে আছে, আর ফল-ফুলের গাছসহ অজানা কত গাছ এক এক করে তার সামনে এসে দর্শন দিয়ে যায়। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ইউশা তন্ময় হয়ে ভাবছে। মনে মনে বলছে, তোমার সৃষ্টি যদি হয় হে আল্লাহ এত সুন্দর, না জানি তুমি কত সুন্দর! মৃত্যুর পর তোমার দিদার-দর্শনে সৌভাগ্যবান হবে যারা, তাদের কাতারে আমাদের শামিল কর হে প্রভু!

ইতোমধ্যে ইউশার মোবাইল বেজে উঠল। কলটি রিসিভ করল।

তোমরা বিজ্ঞানকে কুরআনের ওপর চাপিয়ে থাক। কুরআনের ভাব ও মর্ম বিকৃত করে তাকে বিজ্ঞানের সাথে জোড়াতালি দিয়ে থাক। বল, সত্যি বলছি কি না? আরও শোন, বিজ্ঞানের যে বিষয়টির সাথেই কুরআনের যে বক্তব্য মিলে যায়, সেটাকেই তোমরা কুরআন বলে চালিয়ে দাও। কেন? বৈজ্ঞানিক থিওরি কি পরিবর্তিত হয় না? তখন কি কুরআনও পরিবর্তিত হবে। অপরপ্রান্ত থেকে বলা হল কথাগুলো।

কে আপনি? কোথায় থেকে করছেন?

আমার কথা সঠিক কিনা বল, কে বা কোথায় দিয়ে কী করবে?

ইউশা ভেবে কূল পায় না, চলন্ত যানে এতবড় সওয়াল কেই বা করতে পারে?

ইউশা বলল, আমি আপনার হৃদয়ের অভিব্যক্তি বুঝতে পারছি। বিজ্ঞানকে কুরআনের ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, বর্তমানে কেউ কেউ কুরআনের প্রতি অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে মাঝে মধ্যে কুরআনের অযৌক্তিক ও অবাস্তব ব্যাখ্যা করে বসে, তাদের সেসব ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাবে না। কুরআন বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। তাই যারা 'কোরআন ও বিজ্ঞান' বিষয়ে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ও মধ্যমপন্থাবলম্বী, তারা দু'টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করেন।

এক. কুরআন মাজিদের যেসব আয়াত কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদ ধারণ করে না। সেসব আয়াতের ওপর কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রয়োগ করা যাবে না।

দুই. কুরআন শরিফের যেসব আয়াত সুনির্দিষ্ট মত ধারণ করে আর বৈজ্ঞানিক মতবাদ তার বিরুদ্ধে যায়, তা হলে বিজ্ঞানের মতবাদের সাথে মিলাবার জন্য কুরআনের সেসব আয়াতের অপব্যাখ্যা করা উচিৎ হবে না।

উদহারণত আমরা জানি পৃথিবী গোলাকার। বিখ্যাত এক টিভি বক্তা কুরআন শরিফের আয়াত وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا বাক্য থেকে উদ্ঘাটন করেছে, পৃথিবী গোলাকার। যুক্তি হল, دَحَا ক্রিয়ার মূল ধাতুবিশিষ্ট একটি বিশেষ্যের অর্থ হল, উটপাখির ডিম। অথচ دَحَا ক্রিয়ার মধ্যে ডিমের অর্থ নেই। ডিমের অর্থ আছে الأُدْحِيُّ الأُدْحِيَّةُ ইত্যাদি বিশেষ্যের মধ্যে। সন্দেহ নেই, কুরআন মাজিদের কিছু কিছু আয়াত দ্বারা অবশ্যই অনুমিত হয়, পৃথিবী গোলাকার। কিন্তু তা প্রমাণ করার জন্য এই আয়াতের কী দরকার? আরেকটি উদাহরণ।

অধিকতর দ্রুত গতির বস্তু কী? সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত হল, আলো। আলোর গতি সর্বাধিক দ্রুত। কুরআন মাজিদে সুরা সাজদায় আছে, 'আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত প্রতিটি কাজের ব্যবস্থাপনা তিনি নিজেই করেন। তারপর সে কাজ এমন এক দিনে তার কাছে ওপরে পৌঁছে, তোমাদের গণনা অনুযায়ী যার পরিমাণ হয় হাজার বছর।' অনেকে বলতে চান, এই আয়াতে আলোর গতির দিকে ইশারা করা হয়েছে। মিসরের প্রখ্যাত বিজ্ঞানগবেষক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুদ দায়িম কাহিলকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা সুরা সাজদার উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাপারে বলে থাকেন, আয়াতটিতে আলোর গতির দিকে ইশারা করা হয়েছে। কিন্তু আমার

মতে বক্তব্যটা সঠিক নয়, এই এই কারণে। তিনি আমার বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, 'হ্যাঁ, ভাই, এই বক্তব্যটি খুবই প্রশ্নবিদ্ধ। তাই আমি আমার ওয়েবসাইট থেকে এবিষয়ে লেখা প্রবন্ধটি ডিলিট করে দিয়েছি। যারা আয়াতটি থেকে আলোর গতির বিষয়টি উদ্ঘাটন করেছেন তারা সূক্ষ্মতার পরিচয় দিতে পারেননি।'

উদাহরণদু'টির আলোকে আমরা জানতে পারি, বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয় কুরআনে উল্লেখ থাকবে, মূর্খতাসূলভ ধারণা। সুতরাং পবিত্র কুরআনের কোন বক্তব্যে যদি কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদের আভাস না থাকে তা হলে সেই বক্তব্যের ওপর কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রয়োগ করা হবে অনুচিত ও গর্হিত কর্ম।

আর আপনি বললেন, কুরআনের ব্যাখ্যা আপনারা বিজ্ঞানের আলোকে করছেন। বিজ্ঞান যদি ভুল হয়, তা হলে পরিণামে কুরআন ভুল প্রমাণিত হবে না? কথাটি চমৎকার। এজন্যেই পবিত্র কুরআনের মান্যগণ্য গবেষকরা বলেন, বিজ্ঞানের 'প্রতিষ্ঠিত সত্য' ছাড়া বিজ্ঞানের অমীমাংসিত মতবাদের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা দেয়া অনুচিত। যেমন: কুরআন মাজিদে সুরা আলাকে আছে, كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ অর্থাৎ, শোনে রাখ, সে যদি বিরত না হয় আমরা অবশ্যই তার 'নাছিয়া' ধরে টানব; মিথ্যাবাদী, ভুলকারী নাছিয়া।

নাছিয়ার শাব্দিক অর্থ হল, مقدم الرأس বা মাথার সম্মুখভাগ। উল্লিখিত আয়াতে মাথার অগ্রভাগকে মিথ্যুক, ভুলকারী বলা হয়েছে। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, মাথার অগ্রভাগ মিথ্যা ও ভুল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু একটা সময় ছিল, যখন মানুষ জানত না এবং অনেকে এখনও জানে না, মাথার অগ্রভাগ তথা মাথার অগ্রভাগে অবস্থিত মস্তিষ্কের আগ্রভাগ (Frontal Lobe) প্রধান ভূমিকা রাখে মিথ্যা ও ভুল প্রকাশে। তাই তারা 'কুরআনকে ভুল থেকে বাঁচাতে' আশ্রয় নেয় একটি ব্যাখ্যার; আমি অবশ্যই তার মাথার অগ্রভাগ ধরে টানব, যে মাথার অগ্রভাগের অধিকারী মিথ্যা ও ভুল করে থাকে! এমন ব্যাখ্যার কী প্রয়োজন? তুমি যদি না জান কিংবা আয়াতের মর্ম যদি তোমার কাছে দুর্বোধ্য লাগে তা হলে তুমি চুপ থাক।

কুরআনের প্রতিটি মর্ম অবশ্যই পরিষ্কার হবে; হয়ত আজ, না হয় কাল, না হয় ‘পরকাল’। তখন কুরআন বিরোধীরা লাঞ্চিত, অপদস্থ হবে।

প্রকৃত বিষয় হল, মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ (Frontal Lobe)-র কয়েকটি অংশ মিথ্যা ও ভুল প্রকাশের প্রধানকেন্দ্র, কোরআন যেমনটা বলছে। কয়েক দশক আগেও মানুষ জানতো না এসত্যটি। University of Pennsylvania-র গবেষকরা আঠারজন ছাত্রের ওপর গবেষণা চালিয়ে যে ফলাফলে পৌঁছে, তা হল– The brain sections include the anterior cingulated gyrus, located deep in the brain towards the top of the head, and parts of the prefrontal and premotor cortexes, both located in the very front of the brain.

ছাত্ররা যখন মিথ্যে বলেছে, মস্তিষ্কের যে অংশগুলো মনোযোগ ও ভুল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল, সে অংশগুলো অধিক সক্রিয় ছিল। এ অংশগুলো মাথার ওপরে এবং সম্মুখভাগে অবস্থিত।

তাই যতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের চূড়ান্ত ফায়সালা প্রকাশ না পাবে ততদিন পর্যন্ত কোন বিজ্ঞান নামধারীর বক্তব্যে কর্ণপাত করব না আমি। কুরআনের বক্তব্যের অপব্যাখ্যায়ও মনোযোগ দেব না। আমি প্রতীক্ষার প্রহর গোনব। কুরআনেই তো আছে ‘প্রতিটি সত্য প্রকাশের রয়েছে নির্ধারিত সময়’।

ইউশা মোবাইলে কথা বলা শেষ করল। গন্তব্য চলে এসেছে। রেল থেকে নেমে সে আশপাশে দৃষ্টি বুলাল। হঠাৎ, এক ভদ্রলোক তার কাছে এসে সালাম দিয়ে হাত মোসাফাহা করলেন। ইউশা অবাক হল। কে আপনি? আপনাকে কি সাগর পাঠিয়েছে? ভদ্রলোক বললেন, নদী সাগর নামে আমি কাউকে চিনি না। কিছুক্ষণ আগে মোবাইলে তোমাকে একজন প্রশ্ন করেছিল না? হ্যাঁ, করেছিল। তা আপনি জানলেন কীভাবে? আমিই সেই লোক। তোমার কয়েক সিট পেছনে ছিলাম।

‘অবৈজ্ঞানিক’ নাকি ‘বিজ্ঞানের অনুপস্থিতি’

ইসলাম বিদ্বেষীদের বিশেষত, নাস্তিকদের কুরআন কারিমের ওপর আপত্তি করার একটি বড় অস্ত্র হল, ‘বিজ্ঞানে নেই’। অর্থাৎ, কুরআন মাজিদের যেসব বৈশ্বিক বক্তব্যের ব্যাপারে বিজ্ঞান এখনও নীরব, সেসব বক্তব্যের ব্যাপারে ওরা বলে বেড়ায়, এই তথ্য বিজ্ঞানে নেই তাই এটা সঠিক নয়। অমুক বিষয়টা বিজ্ঞানে নেই তাই তা ভুল ও পরিত্যাজ্য। ওদের এই ‘নেই’ ‘নেই’ আপত্তির গোমর ফাঁস করা হয় এই অধ্যায়ে।

ব্রুকলমানের প্রতি ইউশার চিঠি

ইউশা একবার তার নাস্তিক সহপাঠীদের জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা কি জান, নাস্তিকেরা যে ডারউয়িনের আশ্রয় নিয়ে নাস্তিকতার ভিত মজবুত করে সেই ডারউয়িন নাস্তিক ছিল না? তারা সমস্বরে বলে ওঠে, অসম্ভব। তুমি এসব আজগুবি তথ্য কোথায় যে পাও? সে আবার জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি জান, বার্ট্রান্ড রাসেল যাকে হুমায়ুন আজাদের মত লোকেরা গুরু মানে সে নাস্তিক ছিল না? তারা আরও তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। বলে, ডাহা মিথ্যা কথা। হতেই পারে না। আমরা তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, যদি এমন কথা দেখাতে পার, আমরা আজই নাস্তিকতা বিসর্জন দেব।

ইউশা তাদের বলে, the Autobiography of Charles Darwin গ্রন্থে চার্লস ডারউয়িন লিখেছেন, Extreme difficulty or rather impossibillity of conceving this immense and wonderful universe, including man with his capability of looking far into futurity, as the result of blind chance or cecessity. When thus reflecting i feel compeled to look to a first coasus having an intelligent mind in some degree analogous to that of man; and i deserve to be called a theist

ডারউয়িন বলছেন, এই ধারণা করা সুকঠিন বরং অসম্ভব যে, ভবিষ্যৎ বিষয় খতিয়ে দেখার মত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষসহ এই বিস্ময়কর সুবিশাল জগৎ অন্ধ আকস্মিকতার কারণে কিংবা প্রয়োজনের তাড়ায় অস্তিত্বে এসেছে। ফলে আমি বুদ্ধিমান পরিকল্পনাকারী অনুভব করতে বাধ্য হই। তাই আমাকে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী বলতে পারেন।[১]

কথাটি ইউশার সহপাঠীদের কাছে বজ্রপাতের মত মনে হল। তাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই ইউশা তাদের শুনাল বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কথা। বার্ট্রান্ড রাসেলের কন্যা কেথরিনা টেইট বলেন, Russell's whole

---

[1] Charles Darwin, the Autobiography of Charles Darwin. Nora Barlow London: Collins, p: 92-93

life was a search for god.... somewhere at the back of my father's mind, at the bottom of his heart, in the depths of his soal, there was an empty space that had once been filled by god, and he never found anything else to put in it

কেথরিনা বলেন, রাসেল সারাজীবন আল্লাহর অস্তিত্বের সন্ধানে ছিলেন। আমার বাবার হৃদয়ের গহীনে একটি শূন্য স্থান ছিল, যা একসময় আল্লাহর ভক্তি- ভালোবাসায় পূর্ণ হয়।

ইউশার সহপাঠীরা কথাগুলো শুনল এবং স্বচক্ষে দেখল। কিছু না বলতে পেরে তারা চলে যেতে লাগল। ইউশা পেছন থেকে ডাক দিয়ে বলে, এই যে শোন। স্টিফেন হকিংও আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে। রাগে গজ গজ করতে করতে তারা দ্রুত পদক্ষেপে দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়।

রাতে ইউশার বাসার দরজা নক করে ব্রুকলমান।

হায় ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম, কী জন্যে আসা হল?

স্টিফেন হকিং নিয়ে তুমি কী যেন বলতে চেয়েছিলে?

বলতে চাওয়াই শুধু নয়। অলরেডি বলেছি; একসময় স্টিফেন হকিংও আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করেছিল।

তা কীকরে সম্ভব?

স্টিফেন হকিং একবার জেরুযালেম ভ্রমণে গেলে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন? উত্তরে তিনি জানান, তিনি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই ঐশ্বরিক শক্তি প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার পর বিশ্ব পরিচালনায় তার আর প্রয়োজন নেই।[২]

স্টিফেন হকিং the grand desgin গ্রন্থে এবং বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে বলেছে, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা নেই। তা হলে তুমি এর কী ব্যাখ্যা দেবে?

---

[2] There Is A God, Antony Flew, P: XIX

কোন সন্দেহ নেই, হকিং পৃথিবী বিখ্যাত ও সর্বসমাদৃত বিজ্ঞানী। মহাবিশ্বের সুবিন্যস্ত গঠন এবং মহাবিশ্ব পরিচালিত হওয়ার সুসংহত নিয়ম তারা যখন প্রত্যক্ষ করে তখন ‘সৃষ্টিকর্তা’র অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু যখন নাস্তিক্যবাদ মনমস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন ঠুনকো যুক্তি দিয়ে হলেও আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে বসে। উদাহরণত হকিং বলে, মহাবিস্ফোরণের আগে টাইম ও সময়ের অস্তিত্ব ছিল না। আচ্ছা, মহাবিস্ফোরণে বিস্ফোরণ ঘটেছিল কীসের? স্তুপীকৃত ও পুঞ্জীভূত পদার্থরাশির অবশ্যই। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, মহাবিস্ফোরণই কি জন্মদিয়েছিল ওসব পদার্থের, না মহাবিস্ফোরণের আগেও অস্তিত্ব ছিল ওসবের? বিস্ফোরণ স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয়, বরং কোনকিছুকে নিয়ে ঘটে থাকে বিস্ফোরণ। তাই মহাবিস্ফোরণ ওসব পদার্থের জন্ম দিতে পারে না। বরং জন্ম লাভ করা ওসব পদার্থকে আশ্রয় করেই ঘটেছিল মহাবিস্ফোরণ। তা হলে বলতেই হবে, মহাবিস্ফোরণের আগেই অস্তিত্ব লাভ করেছিল ওসব পদার্থ। এখন কি প্রশ্ন জাগে না, সময়ের আশ্রয় ছাড়া ওসব পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করেছিল কীভাবে? এমন বাহ্যিক বিষয়টা কি হকিংয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে? পারে না। কিন্তু তাকে এড়িয়ে যেতে হয়েছে। অন্যথায় স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার পথ যে রুদ্ধ হয়ে যায় তার সামনে?

ব্রুকলমানের মনে ইউশার কথাগুলো গভীর রেখাপাত করে। সে তার বাসায় গিয়ে তন্ময় হয়ে ভাবতে থাকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে। সুদীর্ঘ ভাবনা ও গবেষণার পর তার মন সাড়া দেয় শাশ্বত সত্যের—বিশ্বের আছে সৃষ্টিকর্তা। সে ইসলাম সম্পর্কে জানতে কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন শুরু করে। ইতোমধ্যে সে তার পরিবারের সাথে চলে যায় আমেরিকায়।

অমায়িক আচরণের ফলে সে সহজেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তার বন্ধুমহলে। কিন্তু তারা যখন জানল, সে কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন করে। কুরআন মাজিদের প্রতি তার রয়েছে অব্যক্ত আকর্ষণ। তখন তাদের কয়েকজন তার ওপর আপত্তি করে বসে, এই একুশ শতকে এসে যারা জান্নাত, জাহান্নাম, সাত আসমান ইত্যাদির কথা বলে, তারা নিজেরাই ধ্বংস করে দেয় নিজেদের প্রতিভা। এই একুশ শতকের বিজ্ঞান কি তোমাকে শেখায় না, প্রাণ, পরবর্তী জীবন বলতে কিছু নেই। আল্লাহ বা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছু নেই। আর তুমি যে ‘কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা’র কথা বল, তা সম্পূর্ণ

ভিত্তিহীন। মুসলমানদের চরম ধোকা ও ধাপ্পাবাজি। বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের কোন সম্পর্ক নেই। এরকম অনেক আপত্তির সম্মুখীন হতে হল ব্রুকলমানকে, যার খোলাসা হল, কুরআন যা বলে, তার অধিকাংশই বিজ্ঞান বিরোধী। বিজ্ঞানে সেসবের কোন অস্তিত্ব নেই।

ব্রুকলমান এবিষয়ে ইউশার সাথে আলোচনা করাটা সমীচীন মনে করে। সে ইউশার কাছে চিঠি পাঠায়। তার চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে ইউশার কলমে ফুটে ওঠে নিম্নোক্ত লেখাটি।

কুরআন মাজিদের প্রতি যাদের দৃষ্টিভঙ্গি বক্র, তারা কুরআন মাজিদে ‘বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা’র নাম শোনামাত্রই আদাজল খেয়ে লেগে যায় দু’টি কাজের একটি করতে।

এক. যখন কুরআন মাজিদের কোন আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন বৈজ্ঞানিক সত্য দ্বারা সমর্থিত হয়। তখন তারা বলে,

*এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মুহাম্মাদের আগ থেকেই মানুষ এমনটা জানত।

*এটা সাধারণ বিষয়, অলৌকিকতার কিছু নেই এতে ।

*আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলে, আয়াতের অর্থ এটা। কিন্তু তোমরা উদ্দেশ্য নিচ্ছ অন্যটা।

উদাহরণত, পবিত্র কুরআনে আছে, যুলকারনাইন বাদশা সূর্যকে ‘আইন হামিআ’য় (এর একটি অনুবাদ, ‘পঙ্কিল’ জলাশয়) ডুবে যেতে দেখেছেন। কুরআন ব্যাখ্যাতারা শুরু থেকে অদ্যাবধি তাদের বলে আসছেন, এখানে ডুবে যাওয়া মানে বাস্তব ডুবে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়। তারা বলে, না। কুরআনে এটাই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। যখন আমরা তাদের বলি,

১. কুরআন কারিমে এরপরেই তো আছে যুলকারনাইন সূর্যকে একটি জাতির ওপর উদিত হতে দেখেছেন। তিনি কি আসলে সূর্যকে তাদেরই ওপর উদিত হতে দেখেছেন? কুরআনে আছে সূর্য জ্বলন্ত আগুন। সুতরাং তাদের ওপর যদি সূর্য উদিত হত, তারা তো ভস্মছাই হয়ে যেত, তা হলে তাদের তিনি জীবিত দেখলেন কীভাবে? আর এখানে

যদি 'তাদের ওপরই সূর্য উদিত' হওয়া উদ্দেশ্য না হয়, তা হলে ওখানে 'জলাশয়েই সূর্য ডুবে যাওয়া' উদ্দেশ্য হবে কেন? তখন তাদের কিছু বলতে দেখা যায় না।

২. কুরআনে আছে, পৃথিবী মানুষের জন্য 'দোলনা'। পৃথিবী মানুষের জন্য 'বিছানা'। এসবের দ্বারা একথাই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, পৃথিবী মানুষের জন্য বসবাসোপযোগী। পৃথিবী মানুষের জন্য শান্তি ও স্থিতিআলয়। এর দ্বারা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে। কারণ সূর্যের মত প্রকাণ্ড জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডলী যদি পৃথিবীর সাথে মিশতে পারে, তা হলে পৃথিবী মানুষের জন্য দোলনা ও বিছানা হওয়া তো দূরে থাক, সূর্য পৃথিবীতে মানুষসহ কোন প্রাণী সৃষ্টিই হতে দিত না।

৩. যখন তাদের প্রশ্ন করি, আচ্ছা, তোমরা কী বলতে চাও, একটু রিপিট কর দেখি? তারা বলে, একটু কেন পুরোটাই রিপিট করছি; কুরআনে আছে, সূর্য পৃথিবীর একটি জলাশয়ে ডুবে যাচ্ছিল। তা হলে শোন, কুরআনে আছে সূর্য তার কক্ষপথে ভাসমান। এতে প্রমাণিত হয়, সূর্য একটি নির্ধারত স্থান দিয়েই সদা অতিক্রান্ত হয়ে থাকে। বল, সেই 'জলাশয়ে'র মধ্য দিয়ে সূর্যের অতিক্রান্ত হওয়াটা কি তার কক্ষপথের অন্তর্ভুক্ত না অন্তর্ভুক্ত নয়? তখন বলে, না। পৃথিবীর জলাশয় সূর্যের কক্ষপথ হতে যাবে কেন? তা হলে তোমরা একথাও স্বীকার করে নিচ্ছ যে, সেই জলাশয়ে সূর্য ডুবতে পারে না, যেহেতু সেটা সূর্যের কক্ষপথে পড়ে না।

৪. কুরআনে আছে, 'সূর্য চাঁদের নাগাল পেতে পারে না'। চাঁদ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। আর সূর্য দূরে চাঁদের থেকে। তা হলে সূর্য তো পৃথিবী থেকে চাঁদের থেকেও অনেক অনেক দূরে। বাস্তবতা যেহেতু এমনটাই, সেহেতু পৃথিবীর জলাশয়ে সূর্যের ডোবার কথা কুরআনে থাকবে কেন?

আমরা এভাবে সেভাবে অনেকভাবে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করি। কিন্তু ওরা বোঝে না। ওরা কেন যে বোঝে না? আল্লাহ ওদের সুমতি দান করুন।

দুই.বিশ্ব ও বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কিত কুরআন মাজিদের এমন বক্তব্য যে ব্যাপারে বিজ্ঞান এখনও নীরব–কোন সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। এসব ক্ষেত্রে ওরা বলে, এসব মতবাদ বিজ্ঞান বিরোধী।

ওরা বলে, প্রথম আসমান বলতে কিছু নেই। দ্বিতীয় আসমান বলতে কিছু নেই।

আশ্চর্য, এই যে 'নেই'; এই 'নেই'টা তুমি কীভাবে বলছ? কোন বিজ্ঞানী কি এপর্যন্ত দাবি করেছে, মহাকাশের শেষ সীমানায় বিজ্ঞানীদের চোখ পৌঁছেছে, কিংবা মহাকাশের শেষ সীমানা তারা আঁচ করতে পেরেছে? এমন দাবি কেউ করেনি। তা হলে মহাকাশের শেষ সীমানাই যখন তুমি পাচ্ছ না, সেহেতু শেষ সীমানার ব্যাপারে জ্ঞান বিতরণ করতে যাচ্ছ কেন তুমি?

কুরআন মাজিদে আছে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে আল্লাহর 'আরশ' ছিল পানির ওপর। ওরা এ কথা শুনে হাসে; সে সময় পানি আসবে কোত্থেকে?

একসময় ধারণা ছিল, পানি পৃথিবীর নিজস্ব সম্পত্তি। পরে দেখা গেল মঙ্গল গ্রহেও আছে পানি। তারা পানির উৎপত্তি নিয়ে বলল, ধূমকেতু থেকে পানি তৈরি। পরে বলল, উল্কাপিণ্ড থেকে তৈরি। কিন্তু যখন দেখল মিলিয়ন মিলিয়ন সৌরবর্ষ দূরের গ্যালাক্সি ও তারকারাজ্যে আছে পানির সাগর। তখন বলতে বাধ্য হল, আমরা নিশ্চিত জানি না, পানির উৎপত্তি কিসের থেকে কিংবা কখন থেকেই-বা আছে পানি মহাবিশ্বে? এই হল যখন বাস্তবতা, তখন তুমি কোন প্রমাণের আলোকে বলছ, পৃথিবী সৃষ্টির আগে বা সে সময় পানি থাকতে পারে না?

বিজ্ঞানের শিক্ষা কি এটাই? কী মূর্খতা ও অজ্ঞতাসুলভ কাণ্ড? ওদের এই 'নেই' 'নেই' বুলি শুনতে শুনতে আমরা বিরক্ত। শুধু 'না দেখা' আর 'না জানা'টাই যদি কোন কিছু অবাস্তব ও অবান্তর হওয়ার প্রমাণ হয় তা হলে এ কথা বলা কি অন্যায় হবে যে, হার্টের স্মৃতিশক্তি বলতে কিছু ছিল না? বিজ্ঞানীরা যখন হার্টের স্মৃতিশক্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, কেবল তখনি হার্ট স্মৃতিশক্তির অধিকারী হয়েছে? এটা বলা যদি ঠিক না হয়, তা হলে এই ক'দিন যে হার্টের বোধ-বুদ্ধি নেই বলে আসছিলে, কিসের ভিত্তেতে এই 'নেই'য়ের দাবি করে আসছিলে?

এরকম প্রচুর প্রতিষ্ঠিত সত্য রয়েছে যা মিথ্যে বলে দেয়া হয় শুধু 'না দেখা' আর 'না জানা'র কারণে। প্রাণ বলতে কিছু নেই। মৃত্যুপরবর্তী জীবন বলতে কিছু নেই। এমন কথা যারা বলে তাদের জন্য সুপথ প্রাপ্তির কামনা ছাড়া আর কিছুই নেই আমাদের। বিজ্ঞান তো প্রাণের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা অব্যাহত ও অবিরামভাবে করে যাচ্ছে। সুস্পষ্ট ফল তারা এখনও লাভ করেনি। বিজ্ঞানী রবার্ট ওয়াইট সারাজীবন সাধনা করে গেছেন প্রাণ ও জীবনের 'ক্লু' উদ্ঘাটন করতে। কিন্তু তার সাধনা চূড়ান্ত ফল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি।

বিজ্ঞানের সম্পর্কই হচ্ছে 'মেটেরিয়াল ও পদার্থে'র সঙ্গে, সুতরাং যেখানে পদার্থ নেই। সেখানে বিজ্ঞান নেই। হকিং বা অন্য কেউ কি প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছে, 'প্রাণ' পদার্থের অন্তর্ভুক্ত?

সে বলে, কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ যেমন একসময় অকেজো ও অক্ষম হয়ে যায়, তেমনি আমাদের মস্তিষ্ক-যন্ত্রাংশ অকেজো হয়ে গেলে আমরা বেঁচে থাকি না। তাই মৃত্যুপরবর্তী জীবন বলতে কিছু নেই। হায়রে হকিং, কোথায় কম্পিউটার যন্ত্রাংশ আর কোথায় মাথার ব্রেইন ও এর 'যন্ত্রাংশ'! কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ অকেজো হয়, নষ্ট হয়। ফলে কম্পিউটার বাতিল হয়। প্রশ্ন হল, কোন কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ অকেজো হয়ে কম্পিউটার নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, কিন্তু কোন প্রকৌশলী উদ্ঘাটন করতে পারেনি, কোন্ যন্ত্রটা নষ্ট হল, আর কেনই-বা নষ্ট হল? কম্পিউটার আবিষ্কৃত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত এমনটা ঘটেছে? ঘটেনি। বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ প্রকৌশলী ধরে ফেলতে পারে কোন যন্ত্রাংশের সমস্যার কারণে কম্পিউটারের অকেজো অবস্থা। পক্ষান্তরে মাথা ও মাথার ব্রেইন! হকিংয়ের বন্ধু রবার্ট ওয়াইট মারা গেছে। হকিং বেদনাভারাক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু হকিং কি বলতে পেরেছে, ওয়াইটের মাথার কোন হরমন কিংবা কোন অর্গান কিংবা কোন গ্ল্যান্ড অকেজো হয়ে পড়ার দরুন মারা গেল ওয়াইট? পারেনি। পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানী আজ পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পারেনি দেহের কোন জিনিসটা চলে যাবার কারণে 'সম্পূর্ণ সুস্থ্য' লোকটি মারা যায়। তারা অপেক্ষায় আছে। অপেক্ষায় আছি আমরাও। দেখা যাক ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কী উপহার দেয় পৃথিবীকে। কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে 'প্রাণে'র স্বতন্ত্রত্ব না করে দেয়া এবং তার ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুপরবর্তী জীবন না করে দেয়া বিশ্বস্ত ব্যক্তির অবিশ্বস্ত ও অগ্রহণযোগ্য কাণ্ড।

মানুষ এরিস্টটল ও টলেমির ওপর কত খেপা। কারণ তারা পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্রে রেখে ছিল। রেখে ছিল পৃথিবীকে স্থির আর তার চতুর্পাশে ঘুরিয়েছে চাঁদ সূর্যসহ বাকি গ্রহ-উপগ্রহগুলোকে। চিন্তা করলে বুঝতে কষ্ট হবে না, তারা এই ভুলটা করেছে সঠিকটা না জানার কারণে। অনেক রুশ বিজ্ঞানী মহাকাশকে করেছিল স্থির, অনড়। কিন্তু এডউয়িন হাবলের দৈত্যকার দুরবিন ভিত ভেস্তে দেয় তাদের মতবাদের। ভুলটা তাদের হল কেন? কারণ সঠিকটা না জেনেই মত প্রকাশ করেছিল তারা। গ্যালিলীও সৌরজগতের কয়েকটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি যদি বলতেন, সৌরজগতে এছাড়া আর কোন উপগ্রহ নেই, তা হলে অবস্থা কী দাঁড়াত? হাবল তার দুরবিন দিয়ে এমন অনেক ছায়াপথ দেখেন, যা তার আগের কেউ জানেনি। কিন্তু তিনি যদি বলতেন, মহাকাশে এছাড়া আর কোন গ্রহ নেই, তা হলে কি অন্যান্য গ্যালক্সি, ক্লাস্টার, সুপারক্লাস্টারগুলো নাই হয়ে যেত? সুতরাং সঠিকটা না জেনে যারা মত প্রকাশ করে, ভবিষ্যৎ তাদের ক্ষমা করে না। আর যারা 'সীমা'য় দাঁড়িয়ে প্রকাশ করে তাদের মত, তারা ভুল থেকে বাঁচতে পারে।

একদল নাস্তিককে দেখি, এ বলে লম্প ঝম্প শুরু করেছে যে, 'কুরআন-সুন্নায় উল্লেখ করা হয়ছে, নারীর মেধা পুরুষের চেয়ে কম।' না। না। এটা বিজ্ঞান বিরোধী কথা। নারীপুরুষের মেধায় বেশকম রয়েছে; বিজ্ঞান বলছে, এই আজগুবি থিওরির কোন অস্তিত্ব নেই।

এমন কথা যারা বলে, ওরা বিজ্ঞানী হওয়া তো দূরে থাক, বিজ্ঞানের চৌহদ্দিতেও প্রবেশের অধিকার রাখে না। বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে এখনও নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। 'সুনিশ্চিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য'রূপে এখনও তা আত্মপ্রকাশ করেনি। এ পর্যন্ত তারা যতটুকু নিশ্চিত হতে পেরেছে, তা হল, পুরুষের ব্রেইনের সাইজ নারীর ব্রেইনের সাইজের তুলনায় বড়। অর্থাৎ, নারীর ব্রেইনের সাইজ পুরুষের ব্রেইনের সাইজের তুলনায় ছোট। কিন্তু কার মেধা বেশি, কার মেধা কম, এবিষয়ে তাদের বিতর্ক করতে দেখা যায়। এই তো, সতের সালেই ইরাসমুস ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীদের একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়, পুরুষরা সাধারণত নারীদের তুলনায় অধিক মেধাবী। বৃটেনের এক বিখ্যাত নারী বিজ্ঞানীও দাবি করেছেন এমনটি। কিন্তু এর বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছে কোন কোন গবেষক। তবে আমরা

নিশ্চিত, বিজ্ঞান অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের এই বক্তব্যের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবে অবশ্যই। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে কুরআন মাজিদের বিরোধ কখনও হয়নি। হবেও না কখনও। হ্যাঁ, বিজ্ঞানের চূড়ান্ত আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা করার মত ধৈর্য ও সহনশীলতা থাকা আবশ্যক।

রিচার্ড ডকিংসকে নাস্তিকসমাজ গুরু মেনে থাকে। কিছু কিছু লোক তার বইগুলো পড়ে এবং খুব পড়ে; সৃষ্টিকর্তার বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার রসদ সংগ্রহ করতে। কিন্তু ডকিংসের ‘গড ডিলিউশন’, ‘সেলফিশ জিন’, ‘ব্লাইন্ড ওয়াচ মেইকার’-জাতীয় গ্রন্থগুলোয় এবং তার সাক্ষাৎকারসমূহে, ‘ইশ্বর’ , কুরআন ও ইসলাম বিরোধিতার বড় একটি অস্ত্র এই ‘নেই’ বিজ্ঞান। এটা বিজ্ঞানে নেই। ওটা বিজ্ঞানে নেই। এই ‘নেই’ ‘নেই’ বলে অনেক চিরন্তন সত্যকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখায় এই ‘আবু জেহেল’। উদাহরণত ‘বোরাকে’র আলোচনা প্রসঙ্গে সে জাযিরা টিভির সাংবাদিককে লক্ষ করে বলে, এই একুশ শতকে এসে কীভাবে যে তুমি এমন বিজ্ঞান বিরোধী বিষয় বিশ্বাস কর? আমি জানি না ডকিংস ‘বোরাকে’র অস্তিত্বে বিজ্ঞান বিরোধী কী পেয়েছে? বিজ্ঞানের কোন শাখার কোন বিজ্ঞানী এমন কোন ‘সূত্র’ আবিষ্কার করেছে, যার ফলে ‘বোরাকে’র অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হতে পারে? ‘বোরাক’ তোমার কাছে আজগুবি হতে পারে। কিন্তু ধ্রুব সত্য হল, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের আগে বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই থাকে অলীক ও আজগুবি। বিজ্ঞান যখন রহস্যের পর্দা উন্মোচন করে তখনই কেবল তা হয়ে ওঠে স্পষ্ট পরিষ্কার। বিজ্ঞানীরা এখনও মানুষের তৈরি অনেক বস্তুরই রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি। তা হলে আল্লাহর তৈরি সব কিছুর রহস্য তারা এত তাড়াতাড়ি উন্মোচন করে ফেলবে, কীভাবে সম্ভব?

এমন কত অনিশ্চিত ও অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে, যেসব বিষয়ে ওরা সুনিশ্চিত ফয়সালা শুনিয়ে দেয়। আর অনেক ‘বিজ্ঞানমনস্ক’ লোক গর্বের সাথে গোগ্রাসে গিলতে থাকে এসব। আল্লাহ রক্ষা করুন আমাদের।

ভাই ব্রুকলমান, অনেক কিছুই লেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময় স্বল্পতার দরুন আর এগোতে পারিনি। পরবর্তী অবস্থা কী দাঁড়ায়, জানাবে অবশ্যই।..................

ব্রুকলমান ইউশাকে পরে জানায়, ইউশার চিঠিটি অনেক উপকার করেছে তার। আগে যারা কুরআন মাজিদের অমুকটা বিজ্ঞান বিরোধী, কুরআন মাজিদের অমুকটা বিজ্ঞানে নেই ইত্যাদি বলে হৈচৈ করত, তারা এখন নীরবতাব্রত পালন করছে।

তথ্যসূত্র:

পানির উৎপত্তি:

* How did Earth get its water?

https://www.sciencenews.org/article/how-did-earth-get-its-water

* Where Did Earth's Water Come From? - Live Science

https://www.livescience.com/33391-where-did-water-come-from.html

*https://phys.org/news/2010-12-theory-earth.html

*http://www.cnn.com/2010/WORLD/europe/09/03/space.starlight.water/index.html

পুরুষরা সাধারণত অধিক মেধাবী নারীদের তুলনায়:

*Erasmus University study claiming men are more intelligent than women

http://www.independent.co.uk/life-style/erasmus-university-men-more-intelligent-women-gender-sexist-science-journalists-misogyny-a7820531.html?amp

*Men ARE more brainy than women it's a simple scientific fact, says one of Britain's top dons

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1274952/Men-ARE-brainy-women-says-scientist-Professor-Richard-Lynn.html

*Do men or women have bigger brains?

https://www.express.co.uk/news/science/801912/Men-women-bigger-brains-science-study-research-revealed

হকিং ও রবার্ট ওয়াইট:

*Head Transplant: A True Story - Short film

http://vimeo.com/groups/secondstory/videos/20230127

*http://arabic.cnn.com/2011/scitech/5/19/Hawking.heaven_fairy/index.html

*https://www.theguardian.com/science/2011/may/15/stephen-hawking-interview-there-is-no-heaven

রিচার্ড ডকিংস

https://youtu.be/9yXqwUxyKYw?t=34

দা ব্রেইন ইন দা হার্ট

যুগযুগ ধরে কুরআন মাজিদ স্পষ্টভাবে বলে আসছে, হার্টের বোধ-বুদ্ধি আছে। হার্টের আছে অনুভব-অনুভূতি। এ কথা শুনে কুরআন বিদ্বেষীরা অবজ্ঞার হাসি হাসত আর বলত, এটা সৃষ্টিকর্তার বাণী? অসম্ভব। সৃষ্টিকর্তা কখনও বলতে পারেন না, হার্টের আছে স্মৃতিশক্তি ও অনুভব-অনুভূতি। কারণ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, হার্টের ব্রেইন নেই। ওদের এ আপত্তি শুনে কোন কোন মুসলিম বক্তা কুরআনের অপব্যাখ্যা করত। বিশ্বস্ত ব্যাখ্যাতারা বলতেন, হ্যাঁ, হার্টের ব্রেইন আছে যেমনটি বলছে কুরআন। কিন্তু বিজ্ঞান এবিষয়ে চূড়ান্ত কিছু এখনও বলেনি। কে শুনত তাদের কথা?

হার্টের আসলেই কি ব্রেইন নেই? তা হলে ভুল প্রমাণিত হবে কুরআন, না হার্টের আছে ব্রেইন, ফলে ভুল প্রমাণিত হবে ওরা? দেখা যাক কী নিয়ে উপস্থিত হল ইউশা এই অধ্যায়ে?

মুয়ায। ইউশার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আসে ইউশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। দীর্ঘদিন পর অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়ে ইউশা যারপরনাই খুশী। আপ্যায়ন সামগ্রী আনতে ছুটল দোকানে। দেখি কী লিখছে ইউশা, বলে ইউশার কম্পিউটারের দিকে এগিয়ে গেল মুয়ায। 'দা ব্রেইন ইন দা হার্ট' শিরোনামের ওপর পড়ল তার চোখ। কী? দা ব্রেইন ইন দা হার্ট মানে? সামনে পড়তে লাগল সে বিপুল বিস্ময় নিয়ে। দেখল, ইউশাকে ইমেইলে প্রশ্ন করেছে একজন, আপনি তো নিজেকে বড় জ্ঞানী মনে করেন। কুরআনের ওপর সবধরণের আপত্তির উত্তর দিতে নাকি সিদ্ধহস্ত। এবার দেখা যাবে কোন কুয়োর ব্যাঙ আপনি। আচ্ছা, আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। হার্টের কি ব্রেইন আছে, না নেই? যদি বলেন, আছে। তা হলে চরম মূর্খ আপনি। কেননা বিজ্ঞান বলছে, হার্টের ব্রেইন ও বোধ-বুদ্ধি নেই। আর যদি বলেন, নেই। তা হলে আপনাদের কুরআনে ভুল আছে। কারণ কুরআনে আছে, অন্তর অনুধাবন করতে পারে ইত্যাদি কথা।

ইউশা উত্তরে লিখছে,

পবিত্র কুরআনে আছে, 'তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা অনুধাবন করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না।'[৩] 'তবে কি তারা ভূমিতে চলাফেরা করেনি, যা দ্বারা এমন অন্তর লাভ হত, যা তাদের বোধ-বুদ্ধি যোগাত কিংবা এমন কান লাভ হত, যা দ্বারা তারা শুনতে পেত। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় সেই হৃদয়, যা বক্ষদেশে বিরাজ করে।'[৪] 'যারা ইমানদার, আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে; শোন, আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে থাকে।'[৫] 'এরপর তোমাদের অন্তর নিষ্ঠুর হয়ে গেল।'[৬]

---

[3] সুরা আরাফ, সুরা- ৭, আয়াত-১৭৯।

[4] সুরা হাজ্জ, সুরা-২২, আয়াত-৪৬। অন্তর বোধ-বুদ্ধির অধিকারী-এব্যাপারে প্রচুর আয়াত আছে। যেমন: সুরা কাহফ, সুরা-১৮, আয়াত- ৫৭। সুরা ইসরা, সুরা-১৭, আয়াত-৪৬। সুরা তাওবা, সুরা-৯, আয়াত-৮৭। সুরা তাওবা, সুরা-৯, আয়াত-৯৩।

[5] সুরা-রা'দ, সুরা-১৩, আয়াত-২৮।

[6] সুরা বাকারা- ২/৭৪।

অন্তর সম্বন্ধে কুরআন মাজিদে এধরণের শত শত আয়াত রয়েছে। যেসবের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, কুরআন মাজিদের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তরের ব্রেইন ও স্মৃতিশক্তি রয়েছে। অন্তরের আবেগ-অনুভূতি রয়েছে। মানুষের জীবনের সুখশান্তি ও অনুভব-অনুভূতি নির্ভর করে অন্তরের ওপর। হার্টের এসব ব্যাপারে কুরআন মাজিদে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে চৌদ্দশ বছর আগ থেকে।

হার্টের ব্যাপারে কয়েকদিন আগেও মানুষের ধারণা কেমন ছিল আমরা অনুমান করতে পারি লিন্ডা মার্কস (Linda Marks)-র বক্তব্য থেকে।

তিনি বলেন, বিশ বছর ধরে আমি মনোবিজ্ঞান চর্চা করেছিলাম। প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করা হত, তুমি কী কর? হার্ট রক্তসঞ্চালন যন্ত্রমাত্র। হার্টের আধ্যাত্মিক এবং আবেগময় কোন জীবন নেই।

আমি অনুভব করতাম, হার্ট যান্ত্রিক পাম্পই শুধু নয়। এর বাইরেও বরং এর অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু আমার তথ্য ও অভিজ্ঞতা যে সঠিক, লোকদের তা দেখাবার জন্য অনেক বছর ধরে আমার কাছে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছিল না।[৭]

বিজ্ঞানীরা হার্টের রহস্য উন্মোচন করতে সক্ষম হয় কীভাবে?

আগের যুগে মানুষের হার্ট বিকল হয়ে গেলে কিছু করার থাকত না তাদের। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হওয়াই মানুষ একজনের হার্ট আরেকজনের দেহে স্থাপন করতে সক্ষম হয়। হার্ট সংরক্ষণ করার এবং কারো হার্ট বিকল হয়ে গেলে তার দেহে সেই মৃত কিংবা নিহত লোকের হার্ট রোপন করার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়।

চিকিৎসকেরা ঘোর বিস্ময়ে দেখল, হার্টদাতার স্বভাব চরিত্র ও স্মরণশক্তি হার্টগ্রহীতার মধ্যে স্থানান্তরিত হয়! তারা বিষয়টির প্রতি ততটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু একের পর এক ঘটনা যখন ঘটেই চলল, তাদের চিন্তার টনক নড়ল এবং হার্ট নিয়ে ভাবার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। নিম্নে তেমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হল।

[7] www.healingheartpower.com/power-heart.html

ঘটনা–০১ একনারী চিকিৎসক বলেন, আমার কাছে আট বছর বয়সী একটি মেয়ে রোগী ছিল। সে দশ বছর বয়সী নিহত একটি মেয়ের হার্ট গ্রহণ করেছিল। তাকে তার মা আমার কাছে নিয়ে এল, কারণ রাত্রে সে তার দাতার হত্যকারী লোকটিকে স্বপ্নে দেখে চিৎকার করছিল। সে বলল, তার মেয়ে জানে হত্যাকারী কে। এই শিশুটি আমাকে যা বলছিল, আমি তার বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারলাম না। তার মা এবং আমি অবশেষে পুলিশ ডাকার সিদ্ধান্ত নিই। মেয়েটি থেকে প্রাপ্তনির্দেশনা কাজে লাগিয়ে তারা হত্যাকারীকে ধরে ফেলে। আমার রোগী যে প্রমাণ পেশ করেছিল, তা সে স্বীকার করে নেয়। সময়, অস্ত্র, স্থান, তার পোশাক, নিহত মেয়েটিকে সে কী বলেছিল... হার্ট গ্রহণকারী ছোট মেয়েটি যা যা বলেছিল, প্রতিটিই সম্পূর্ণ সত্য হয়।[৮]

ঘটনা–০২ হার্টদাতা ছিল আঠার বছর বয়সী তরুণ। সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। হার্টগ্রহীতা ছিল আঠার বছর বয়সী তরুণী।

হার্টদাতার পিতা বলেন, আমার ছেলে সবসময় কাব্য রচনাধ্যানে মগ্ন থাকত। তার একটি কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায়, যা আমাদের সে কখনও দেখায়নি। হার্টগ্রহীতা বলে, যখন নিহতের পরিবার তাকে তার কিছু গান শোনাল, আমি তার গানের বাকিটুকু শেষ করতে সক্ষম হই। আমি কখনও গান গাইনি। কিন্তু হার্ট রোপণের পর আমি গান ভালোবাসতে শুরু করি। আমার অন্তরে আমি গানের প্রতি আকর্ষণবোধ করি। আমি মাকে বলি, আমি গিটার বাজাবার পাঠ গ্রহণ করতে চাই। হুবহু সেই গিটার যা পল (দাতা) বাজাত। তার গানের ছন্দমালা আমার হৃদয়ে বাজে।

ঘটনা–০৩ হার্টদাতার বয়স ১৬। পানিতে ডুবে মারা যায়। হার্টগ্রহীতার বয়স ৭।

হার্টদাতার মা বলে, কারটার যখন আমাকে দেখে, দৌড়ে চলে আসে আমার দিকে। সে তার নাক দিয়ে আমার সাথে ঘষাঘষি করতে লাগল। ঠিক জেরি যেমনটি করত। কারটার হুবহু সেই শিশু-কথা বলত, যেমনটি বলত জেরি।

---

[৮] paul pearsall কর্তক রচিত the heart's code: Tapping the Wisdom and Power of Our Heart Energy। পৃষ্ঠা-৭।

একরাতে আমরা তার (হার্টগ্রহীতার) পরিবারের সাথে থাকি। মাঝরাতে কারটার আমাদের কাছে এল এবং আমাদের সাথে ঘুমোতে চাইল। সে আমাদের জড়িয়ে ধরে, যেমনিভাবে জড়িয়ে ধরত জেরি। আমরা কাঁদতে শুরু করি। অমার, আমার স্বামীর, আমাদের পরিবারের, জেরির পরিচিতদের আর সন্দেহ রইল না যে, আমাদের ছেলের হার্ট আমাদের ছেলের অনেক অনুভব-অনুভূতি ও বোধ-বুদ্ধি ধারণ করছে এবং কারটারের বক্ষ স্পন্দিত করছে।

হার্টগ্রহীতার মা বলে, আমি দেখলাম কারটার তার (হার্টদাতার মায়ের) কাছে গেল। কারটার এমনটা কখনও করত না। সে খুব, খুবই লাজুক। সে তার কাছে গিয়ে বলল, ‘মা, সব ঠিক আছে’। আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়লাম; সে তাকে ডাকছে মা। আরেকটি বিষয় আমাদের অবাক করল। কারটার যখন হার্ট গ্রহণ করল, তার মুখের বামপাশে একটা দাগ দেখা দিল। আমরা জেরির মাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম জেরিরও ঠিক একই জাগায় দাগ ছিল। আমি আরেকটি বিষয় জানাতে চাই। আমরা একসঙ্গে গীর্জায় যাই। এর আগে কারটার জেরির বাবাকে কখনও দেখেনি। আমরা গীর্জায় গিয়ে দেখি জেরির বাবা একদল লোকের সঙ্গে বসা। কারটার আমার হাত সরিয়ে দিয়ে ঠিক তার দিকে দৌড় দিল। সে তার কোলে চড়ল। তাকে জড়িয়ে ধরল। তাকে ডাকল বাবা। আমরা অভিভূত হলাম; সে কীভাবে তাকে চিনল! এমনটা সে কখনও করেনি। গীর্জায় আমার হাত ছেড়ে কখনও অপরিচিত কারো কাছে যেত না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কেন এমনটা করল? সে বলল, সে করেনি। সে বলল, জেরি করেছে এবং সে তার সঙ্গে গিয়েছে।

ঘটনা–০৪ হার্টদাতা ২৪ বছরের নারী। হার্টগ্রহীতা ২৫ বছরের পুরুষ।

হার্টগ্রহীতা বলে, আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম অনুভব করছি। মহিলাদের শরীর যা অনুভব করে এবং যেভাবে অনুভূতির সাড়া দেয় আমার শরীরও তাই করতে লাগল। মহিলারা যেমন করে যৌনচিন্তা করে আমিও তেমনি চিন্তা করছি এখন। হার্টগ্রহীতার গার্লফ্রেন্ড বলে, সে তার কাঁধে বেনিটিব্যাগ ঝুলিয়ে রাখে, শপিং করতে যায়! অথচ সে কখনও শপিং করতে চাইত না। আমি তার সঙ্গে মার্কেটে যাই, যেন একজন মেয়ের সাথে যাচ্ছি! বেনিটিব্যাগ ঝোলাবার ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, এটা তার ব্যাগ!

ঘটনা–০৫ হার্টদাতা তিন বছর বয়সী মেয়ে। যে–পারিবারিক সুইমিংপুলে ডুবে মারা যায়। হার্টগ্রহীতা নয় বছর বয়সী ছেলে। হার্টগ্রহণের আগে পানি তার অপ্রিয় ছিল না। কিন্তু হার্ট গ্রহণের পরে পানির প্রতি সে মারাত্মক ভীতি অনুভব করে! সে বলে, পানিকে সে ভয় পায়, কিন্তু জানে না কী এর কারণ। সে এবিষয়ে কিছু বলতে চায় না।[৯]

এসব ঘটনা বিজ্ঞানীমহলকে ভাবিয়ে তুলল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনোবিজ্ঞানীরা হার্টগবেষণায় আত্মসমাহিত হল। গবেষণায় বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। হার্টগবেষণার বিশ্ববিখ্যাত গবেষণাসংস্থা Institute of HeartMath-র বিজ্ঞানীরা হার্টের ব্যাপারে মানুষকে শোনায় এমন একটি কথা যা তারা একবার শুনলে বিশ্বাস করতে চায় না। বলতে হয় দ্বিতীয়বার, কয়েকবার। তারা বলতে শুরু করে 'দা ব্রেইন ইন দা হার্ট' এবং 'দা ব্রেইনহার্ট'!

Institute of HeartMath এর বিজ্ঞানীরা science of the heart: exploring the role of the heart in human performance নামক বইয়ে লিখেন– Our research and that of others indicate that the heart is far more than a simple pump. The heart is, in fact, a highly complex, self-organized information processing center with its own functional "brain" that communicates with and influences the cranial brain via the nervous system, hormonal system and other pathways. These influecnes profoundly affect brain function and most of the body's major organs, and ultimately determine the quality of life.[১০]

অর্থাৎ, অন্তর আসলেই খুব জটিল ও দুর্বোধ্য, তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে নিজস্ব 'ব্রেইনে'র মাধ্যমে। যা স্নায়ুতন্ত্র, হরমনতন্ত্র ও অন্যান্য পদ্ধতিতে

---

৯ https://www.bibliotecapleyades.net/.../esp_salud25.htm আরও দেখুন www.smh.com.au › World -

১০ science of the heart: exploring the role of the heart in human performance, পৃষ্ঠা-৩

'ক্রেইনিআল ব্রেইন' (মাথার খুলিতে বিদ্যমান মস্তিষ্ক)-র সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং তাকে প্রভাবিত করে। এসব প্রভাব গভীরভাবে প্রভাবিত করে মস্তিষ্ক ক্রিয়াকর্ম, এবং দেহের অধিকাংশ প্রধান অর্গান (দেহযন্ত্র)। তদুপরি তা চূড়ান্তভাবে জীবনের গুণ ও মান নির্ধারণ করে থাকে।

Santa Rosa memorial hospital, California, USA-র মনোবিজ্ঞানী D.Dorothy Marie Mandel বলেন,

The electromagnetic field of the heart is the strongest and largest in the body, far surpassing that of the brain. What this means is that the heart not only puts out its own balancing and regulating hormones, it also instantaneously communicates electromagnetic and chemical information to the rest of the body and to neighboring bodies in the environment as well.[১১]

মনোবিজ্ঞানী ড. ডরোথি ম্যান্ডেল বলেন, ঘোর বিস্ময়ের ব্যাপার হল, হার্টের তরিচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র ব্রেইনের তরিচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক শক্তিশালী এবং অনেক প্রশস্ত। এটি শরীরের অবশিষ্ট অঙ্গের প্রতি তৎক্ষণাৎ তরিচ্চুম্বকীয় ও রাসায়নিক তথ্য প্রেরণ করে—এমনকি পার্শ্ববর্তী শরীরের প্রতিও।

লিন্ডা মার্কস (Linda Marks) বলেন, Research conducted at the Institute of HeartMath suggests that the heart's field is an important carrier of information

এ বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি, হার্ট তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে।

Institute of HeartMath এর মনোবিজ্ঞানী Dr. Rollin McCraty বলেন,

However, we now know that the heart sends more information to the brain than the brain sends to the

---

১১ creation-designs.com/gracemillennium/winter01/mandel.htm

heart[১২] অর্থাৎ, এখন আমরা জানি, ব্রেইন হার্টের প্রতি যে পরিমাণ তথ্য পাঠায়, হার্ট ব্রেইনের প্রতি তথ্য পাঠায় তার চেয়ে অধিক পরিমাণ।

তিনি আরও বলেন, It is now well-established that the heart is far more than a simple pump. It also functions as a hormonal gland, a sensory organ, and an information encoding and processing center, with an extensive intrinsic nervous system sufficiently sophisticated to qualify as a "**heart brain.**"[১৩]

অর্থাৎ, এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, হার্ট রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের চেয়েও অনেক বড় কিছু। হার্ট হরমোনীয় গ্রন্থী, সঙ্গাবহ অর্গান (দেহযন্ত্র), তথ্য এনকোডিং এবং প্রসেসিং সেন্টার তথা তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে থাকে তার স্বকীয় বিস্তৃত স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে, যাকে যথোচিতভাবেই 'হার্টব্রেইন' বা 'হৃদযন্ত্রের মস্তিষ্ক' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

হার্ট নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা এখনও অব্যাহত আছে। হার্টের ভূমিকা ও গুরুত্ব ধীরে ধীরে তাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। এতক্ষণে আমরা যা জানতে পারলাম তা হল, হার্টের ব্রেইন ও স্মৃতিশক্তি রয়েছে। তদুপরি হার্টের রয়েছে আবেগ ও অনুভূতি শক্তি। আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছি কুরআন মাজিদে হার্ট সম্পর্কে এর চেয়ে সুস্পষ্ট, অর্থবহ ও প্রাগ্রসার বক্তব্য রয়েছে।

ইউশা ফেরার আগেই লেখাটি পড়ে ফেলল মুয়াজ। সে ভাবনায় পড়ে গেল, কবে যেন ইউটিউবে কার একটি লেকচার শুনেছিল, যাতে বলা হয়েছিল হার্টের ব্রেইন নেই! শত চেষ্টা করেও মনে করতে পারছে না। ইতোমধ্যে ইউশা চলে এল। ইউশা দেখল, মুয়াজ খুব চিন্তিত, অস্থির।

তোমাকে অমন অস্থির দেখাচ্ছে কেন মুয়াজ?

---

১২ https://www.today.com/.../does-your-heart-sense-your-...
১৩ https://www.researchgate.net/publication/252748187

তোমার ইমেইলে গিয়ে কলব-হার্ট-অন্তর সম্বন্ধে একটি লেখা পড়ে জানতে পারলাম, বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি হার্টের ব্রেইন আবিষ্কার করেছে। লেখাটি খুব, খুব ভালো লেগেছে। তোমার বিজ্ঞানগবেষণার তারিফ করতেই হয়। কিন্তু ইউটিউবে কার যেন একটি লেকচার শুনেছিলাম সে বলেছিল হার্টের ব্রেইন নেই। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কুরআনে তো বলা হয়েছে কলব-হার্ট অনুধাবন করতে পারে, তা হলে কুরআনের এই বক্তব্য কি বিজ্ঞান বিরোধী নয়? সে জবাবে বলেছিল, কুরআনে কোথাও বলা হয়নি, হার্টের ব্রেইন আছে। বাকি থাকল কলব; যার অর্থ হার্ট বা অন্তর হলেও এই কলব শব্দের আরেকটি অর্থ আছে ব্রেইন-বোধবুদ্ধি! তো কুরআন বলছে ব্রেইন অনুধাবন করতে পারে না। হার্টের কথা বলা হয়নি যে, হার্ট অনুধাবন করতে পারে না!

ইউশা বলল, তুমি যার কথা বলছ, তিনি ড. যাকির নায়েক। তিনিই এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তার কয়েকটি লেকচারে।[১৪] এমন ব্যাখ্যা না করলেই ভালো হত, আরবিভাষার কোনও অভিধানে বলা হয়নি, কলব মানে ব্রেইন বা মস্তিষ্ক। এধরণের ব্যাখ্যা কুরআন বিকৃতির শামিল। আমি জানি না কোন বিজ্ঞানী তাঁকে বলেছিল হার্টের ব্রেইন নেই। বিজ্ঞান তখনও নীরব ছিল। বিজ্ঞানের নীরব থাকা আর বিজ্ঞান বিরোধী হওয়া দুটো এক নয়।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়কাল

[১৪] https://youtu.be/sd1KUi8EyJI?t=129
https://youtu.be/vSI7t5xL3tM?t=36
https://youtu.be/O6xyVOzT7dc?t=147

এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মহাবিশ্ব তৈরি হতে লেগেছে বিলিয়ন বিলিয়ন সৌর বর্ষ সময়কাল। কিন্তু পবিত্র কুরআনে কী আছে? কুরআন মাজিদে আছে, মহাজগৎ সৃষ্টি হয়েছে ছয় 'ইয়াওম' সময়ের মধ্যে। কুরআন বিদ্বেষীরা বলে, 'ইয়াওম' অর্থ দিন; চব্বিশ ঘণ্টার সকাল সন্ধ্যাবিশিষ্ট দিন। ফলে পরিণাম কী দাঁড়াল? কুরআনে আছে, মহাবিশ্ব মাত্র প্রচলিত ছয় দিনে তৈরি! এটা নিঃসন্দেহে ভুল। তা হলে মহাবিশ্বের সময়কাল বর্ণনায় পবিত্র কুরআন কি ভুল করেছে? দেখা যাক কী নিয়ে উপস্থিত হল ইউশা এই অধ্যায়ে?

আসসালামু আলাইকুম, ভাই, আসতে পারি? নিমগ্ন চিত্তে অধ্যয়ন করছিল ইউশা। হঠাৎ শব্দ শুনে চমকে ওঠে। তাকিয়ে দেখে তার ক্লাসমেট আলিমুয যামান। আপ্যায়ন পর্বের শেষের দিকে ইউশা জিজ্ঞেস করল, এত দিন পর আসার বিশেষ কোন কারণ আছে কি?

আলিমুয যামান তার সঙ্গে থাকা যুবকের প্রতি ইশারা করে বলল, এ হল রুমী। আমার কাজিন। জাহাঙ্গির নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিভিন্ন নাস্তিকের বইপুস্তক পড়ে কুরআনের ব্যাপারে তার মনে জন্মেছে অনেক সন্দেহ। যদি তার প্রশ্নগুলো শোনতে এবং সেসবের সন্তোষজনক উত্তর দিতে, সে উপকৃত হত!

কিছুক্ষণ আলোচনার পর ইউশা বুঝল রুমির মনে অনেক প্রশ্ন। পরিশেষে রুমি তার ক্ষোভ প্রকাশ করল এ বলে, ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থগুলো মানুষের তৈরি। দেখুন, বাইবেলে আছে, সৃষ্টিকর্তা জগৎ সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। এমন বক্তব্য আছে কুরআনেও। বাইবেল, কুরআনের এ বক্তব্য ভুল। কারণ বিজ্ঞানের অবিসংবাদিত মত, মহাবিশ্বের সৃষ্টি নয় ছয় দিনে; মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে। ধর্মপুস্তকসমূহ যদি স্রষ্টার হত, সেসবে ভুল থাকত না। কুরআন আল্লাহর নয়, মুহাম্মাদের বাণী। মহাবিশ্বের সৃষ্টি ছয় দিনে; মুহাম্মাদ বলেছে ইহুদিদের বলতে শোনে।

ইউশা রুমির এধরণের অনেক আপত্তি শুনল। সে রাগ করল না। বিরক্ত হল না। কারণ এরকম কথা শুধু তার নয়। বরং মিথ্যের বিষ ছড়াতে পারঙ্গম অনেক নাস্তিকের।

বাইবেলের ক্ষেত্রে আমি তোমার সাথে একমত, প্রচলিত বাইবেল আল্লাহর বাণী নয়। তাই তাতে প্রচুর অসঙ্গতি আছে। বাইবেলে জগৎ সৃষ্টির সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে–ছয় দিন। এতে সমস্যা নেই। সমস্যা হল, দিনের সাথে সকাল-সন্ধ্যা উল্লেখ করে দিনের প্রচলিত অর্থটি নির্ধারিত করা হয়েছে, যা স্পষ্টতই ভুল। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ছয় দিন। এর বেশি কিছু নয়। কুরআন শরিফে জগৎসৃষ্টির সময় বর্ণনা করতে 'ছয় দিন' বাক্যটি সাত বার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দিন দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা বলা হয়নি। তাই কুরআনের ওপর শুধু দিন শব্দ দ্বারা তুমি কোন আপত্তি করতে পার না।

আশ্চর্য, দিন দ্বারা দিন উদ্দেশ্য নেব না মানে? নতুন করে শব্দের অর্থ বানাচ্ছেন না কি? সকাল থেকে সন্ধ্যার সময়টুকুই হল দিন, এটা কে না জানে?

এই তো পাশেই আছে 'বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'। আলোচ্য অর্থ ছাড়া দিন শব্দের অন্য কোনো অর্থ আছে কি না জানতে অভিধানটি কখনও দেখেছ?

না। দেখিনি।

তা হলে দেখ। এতে দিন শব্দের মোট পাঁচটি অর্থ আছে। প্রথম তিনটি অর্থ শুনাচ্ছি তোমাকে। ১ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়। ২ চব্বিশ ঘণ্টাকাল। ৩ সময়কাল (সুদিন, দুর্দিন)।

দিনের ইংলিশ হল, Day। এই যে দেখ Oxford Dictionary। এতে Day-র চতুর্থ নাম্বার অর্থ করা হয়েছে a particular period of time।

আমরা দেখলাম, দিন শব্দটি সময়কাল অর্থেও ব্যবহৃত।

এবার রুমি এমন একটি প্রশ্ন করল যা শুনে না হেসে পারল না ইউশা। সে বলল, আরবিভাষায় হয়তো يوم শব্দটি কেবল প্রচলিত দিন অর্থেই ব্যবহৃত হয়!

আমি তোমাকে আরবি অভিধানগ্রন্থে يوم-র অর্থ দেখাচ্ছি। প্রসিদ্ধ প্রাচীন আরবি অভিধানগ্রন্থে আছে, قد يراد باليوم الوقت مطلقا, অর্থাৎ, কখন দিন বলে অনির্দিষ্ট সময়কাল উদ্দেশ্য নেয়া হয়ে থাকে।[১৫] ব্যাপক সমাদৃত আরবি-ইংলিশ অভিধান 'আল মাওরিদে' يوم-র একটি অর্থ করা হয়েছে Time।

আমরা জানলাম, দিন বা يوم-র কয়েকটি অর্থ রয়েছে। এখন আমাদের ভাবতে হবে কুরআন শরিফে কোন অর্থটা উদ্দেশ্য হতে পারে। কোন শব্দের একাধিক অর্থ থাকলে পবিত্র কুরআন নিজে তা নির্ধারিত করে দেয় না। বরং

---

[১৫] লিসানুল আরব ১২ / ৬৫০

শব্দ ও বাক্যের পূর্বাপর এবং বাস্তবতা বিবেচনা করে উদ্দিষ্ট অর্থ নির্বাচন করতে হয়।

না। কুরআনে দিনের অর্থ প্রচলিত দিনই। আপনি অপব্যাখ্যা করছেন। বলল রুমি।

আচ্ছা, তা হলে বলো দেখি, পৃথিবীতে দিন-রাত কেন হয়? সূর্য-পৃথিবীর সাথেই তো এর সম্পর্ক? জগৎ সৃষ্টির সময় যেহেতু সূর্য-পৃথিবী ছিল না। সেহেতু প্রচলিত ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টির কোনও অর্থ হয় না। তাই তুমি আলোচ্য স্থানে দিনের প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য নিতে পারবে না, যেহেতু জগৎ সৃষ্টির সময় প্রচলিত দিনের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

রুমি চুপ।

পাশ থেকে আলিমুয যামান বলল, আমার মনে হয়, দিনের অর্থ প্রচলিত দিনই। কিন্তু 'ছয় দিন' দ্বারা উদ্দেশ্য, ছয় দিন পরিমাণ সময়। অর্থাৎ, আল্লাহ ছয় দিন পরিমাণ সময়ে সৃষ্টি করেছেন মহাবিশ্ব।

ইউশা বলল, দিন দ্বারা প্রচলিত দিন উদ্দেশ্য নিলে, পরে তার ব্যাখ্যা করলে। বল, কোন প্রমাণের ভিত্তিতে এখানে দিন দ্বারা প্রচলিত দিন উদ্দেশ্য নিচ্ছ?

সে বলল, কারণ দিনের এই অর্থটিই প্রচলিত।

দেখ, الْجَارِيَة শব্দের প্রচলিত অর্থ বাঁদী, দাসী। কিন্তু আল্লাহর বাণী, إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ এর মধ্যে الْجَارِيَةِ শব্দের প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য নেয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। উল্লিখিত আয়াতে الْجَارِيَةِ শব্দের অর্থ নৌযান, অথচ তা অপ্রচলিত। সুতরাং প্রচলিত অর্থ সব স্থানে প্রযোজ্য হয় না। বরং শব্দ ও বাক্যের পূর্বাপর এবং বাস্তবতা বিবেচনা করে অর্থ নির্ধারণ করতে হয়।

আলোচ্য স্থানে দিন দ্বারা প্রচলিত দিন উদ্দেশ্য নেয়ার সুযোগ নেই। কারণ তখন তো প্রচলিত দিন ছিলই না। তদুপরি 'ছয় দিন পরিমাণ সময়' ব্যাখ্যারও সুযোগ নেই। কারণ তা বাস্তবতা পরিপন্থী। তাই ছয় দিন দ্বারা অবশ্যই ছয়টি সময়কাল উদ্দেশ্য নিতে হবে, যেহেতু এটাই বাস্তবতা এবং আভিধানিক অর্থও এর সঙ্গ দিচ্ছে।

রুমির চাহনি অনেকটা স্বাভাবিক। মনে হচ্ছে, সে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। ইতোমধ্যে ইউশার মোবাইল বেজে উঠল। কথা শেষ হওয়া মাত্র রুমি বলে উঠল, আর একটি প্রশ্ন। আপনি কি আগের যুগের কোন মুসলিম মনীষীর নাম বলতে পারবেন, যিনি আলোচ্য স্থানে দিনের প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য নেননি?

অবশ্যই। পবিত্র কুরআনের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ফখরুদ দিন রাযি, যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আজ থেকে আট শত বছর আগে, তিনি দিন দ্বারা প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য নেননি। তিনি তার তাফসীরগ্রন্থ ‘আত তাফসীরুল কাবীরে’র ১৩ নাম্বার খণ্ডের ১৬৩-১৬৪ নং পৃষ্ঠায় سِتَّةِ أَيَّامٍ-র অর্থ ছয় দিন করেননি। করেছেন ছয়টি অবস্থায়, ছয়টি পর্যায়ে, ছয়টি ধাপে।

পাহাড়ঃ পৃথিবীর পেরেক

পাহাড় তৈরি হয় কীভাবে, জানত না কেউ। বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় ভূগর্ভস্থ প্রস্তর, মৃত্তিকা ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হবার দরুন তৈরি হয় পাহাড়, বিজ্ঞানীরা জানল আঠার শতকে। কুরআন বিদ্বেষীরা বলে, কুরআনে আছে, পাহাড় তৈরি হয়–কারণ মহাশূন্য থেকে পাহাড় এনে পৃথিবীতে গেড়ে দেয়া হয়। তারা আরও বলে, কুরআন বলছে, পাহাড় পৃথিবীর পেরেক। আশ্চর্য, পাহাড় পৃথিবীর পেরেক হবে কেন? সম্পূর্ণ বিজ্ঞান বিরোধী কথা। কুরআন মাজিদে আছে, পাহাড় তৈরি করা হয়, যেন পৃথিবী টলমল না করে। এর ওপর ওদের কত পণ্ডিত কত আপত্তি যে করে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। চলুন। শামিল হই ইউশার গল্পের আসরে। দেখি সে কী উত্তর দেয় এ সব আপত্তির।

আসাদ এভিনিউয়ের দক্ষিণ পাশের রাস্তা ধরে হাঁটছে ইউশা। যাচ্ছে আসাদগেট থেকে মুহাম্মাদপুরের দিকে । অবাক লাগার বিষয় হল, আসাদগেট থেকে অনেক দূর পর্যন্ত শুধু খ্রিস্টানদের গীর্জা আর শিক্ষালয়। প্রথমে, বাংলাদেশ খ্রিস্টান ছাত্র হোস্টেল। এরপর, সেন্ট পল স্কুল। এরপর সেন্ট খ্রিস্টিয়ানা চার্চ। এরপর সেন্ট যোশেফ হাইর এয়ুকেশন স্কুল। এরপর গ্রীন হেরাল্ড। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, এটি বিশাল বড় একটি খ্রিস্টানপল্লী। ইউশা আনমনে হাঁটছে। ভাবছে সেন্ট যোসেফ স্কুল নারিন্দা থেকে কেন স্থানান্তরিত হয়েছিল এখানে? হঠাৎ কাকতলীয়ভাবে দেখা হয়ে যায় তার দীর্ঘদিনের বন্ধু রুমানের সঙ্গ। সেও তার সঙ্গে হাঁটায় যোগ দিল। কথাপ্রসঙ্গে রুমান ইউশাকে বলল, আমি সেন্ট যোসেফে পড়ি। এখানে আমি বাইবেল দেখেছি। লক্ষ করেছি, এতে বিজ্ঞান বিরোধী অনেক বক্তব্য রয়েছে। আমি কিছু মনে করিনি। কিছু মনে করে না আমার একুইনাস, ইউসাবিউস খ্রিস্টান বন্ধুরাও। আগের যুগে রচিত গ্রন্থে বিজ্ঞান বিরোধী কথা থাকতেই পারে। কিন্তু তোমার বিষয়টি আমার অবাক লাগে, তুমি মানতেই চাও না কুরআনে বৈজ্ঞানিক ভুল আছে। এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি। ইউশা বলল, মানতাম, যদি কুরআনে বৈজ্ঞানিক ভুল থাকত। কিন্তু কুরআনে বৈজ্ঞানিক ভুল নেই।

রুমান বলল, কুরআনে বৈজ্ঞানিক ভুল নেই! তোমাকে দেখাচ্ছি আমি কুরআনে বৈজ্ঞানিক ভুল আছে কিনা।

আমরা জানি, পাহাড় কেন এবং কীভাবে সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর প্লেটগুলো যখন একটি অপরটির দিকে ধাবিত হয়। একটির সঙ্গে অপরটির সংঘর্ষ হয়। প্রচণ্ড শক্তিতে নিচের পাথর ও মাটি ওপরের দিকে চলে আসে। তখন পাহাড়-পর্বত তৈরি হয়। উদাহরণত ভারত-অস্ট্রেলিয়ান প্লেট এবং ইউরেশিয়ান (ইউরোপিয়ান-আমেরিকান) প্লেট পরস্পর সংঘৃষ্ট হলে হিমালয় পর্বত গঠিত হয়। তো বিজ্ঞান বলছে, ভূগর্ভস্থ পাথর ও মাটি ওপরের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়ে পর্বতমালা গঠিত হয়। কিন্তু কুরআনে কী আছে জান?

আমি কী জানি পরে বলা যাবে। আগে বলো তুমি কী জানো। ইউশা বলল।

রুমান বলল, কুরআনে সুরা গাশিয়ায় আছে, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, ‘তারা কি লক্ষ করে না পাহাড়-পর্বতের প্রতি, কীভাবে সেসব স্থাপন করা হয়েছে?’

نُصِبَ অর্থ গাড়া, স্থাপন করা। শুধু তাই নয়। কুরআনে পাহাড় তৈরির ক্ষেত্রে جعل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থও স্থাপন করা। তো কুরআন দ্বারা বোঝা যায় পাহাড়গুলো যেন কোন একস্থান থেকে এনে সেসবের স্থানে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। যেন পাহাড়গুলো কোন গ্রহ থেকে এনে পৃথিবীতে রেখে দেয়া হয়েছে। এধারণা নিতান্তই হাস্যকর।

ইউশা রুমানকে বলল, এই ভুলটা কি তুমি নিজেই ধরেছ না কোন ইহুদি খ্রিস্টান বা নাস্তিকের লেখায় পেয়েছ?

সে বলল, অমুক নাস্তিকের লেখায় পেয়েছি।

ইউশা বলল, এসব লোক কুরাআন পড়ে কুরআনের বাস্তব তথ্য উদ্ঘাটন করতে নয় বরং বিকৃতি ঘটিয়ে কুরআনকে ভুলভাবে পেশ করতে। তাই এমন ঘৃণ্য ও জঘন্য বিকৃতির আশ্রয় তারা নেয় যা ভাবতেও অবাক লাগে। এখানেও ঠিক তাই করেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। পাহাড় সৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতগুলো সামনে রাখলে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তায়ালা পাহাড় সৃষ্টি করেছেন ভূগর্ভস্থ পাথর ও মাটি ওপর দিকে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে। যেমন:

সুরা হিজরে আাছে, সুরা-১৫, আয়াত-১৯: 'আর আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে নিক্ষেপ করেছি সুদৃঢ় পাহাড়-পর্বত এবং আমি তাতে প্রতিটি বস্তু উৎপন্ন করেছি সুপরিমিতভাবে।' এই একই বক্তব্য আছে একাধিক জায়গায়, সুরা নাহল, সুরা-১৫, আয়াত-১৫। সুরা লুকমান, সুরা-৩১, আয়াত-১০। সুরা ক্বাফ, সুরা-৫০।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে পাহাড় সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিক্ষেপ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ভূমিতে পাহাড় নিক্ষেপ করেছেন।

নিক্ষেপের তিনটি অর্থ হতে পারে।

ক. আকাশের কোন গ্রহ থেকে পাহাড়কে ভূমিতে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

খ. পাহাড়কে ভূপৃষ্ঠের একপাশ থেকে আর একপাশে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

গ. ভূগর্ভ থেকে ওপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

এখানে কেবল তৃতীয় অর্থটি প্রযোজ্য হবে। প্রথম অর্থ ও দ্বিতীয় অর্থ নয়।

পুরো কুরআন শরিফে আছে, আল্লাহ এই জিনিসটা করেন। আল্লাহ অমুক জিনিসটা করেন। এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ ওসব অলৌকিকভাবে করেন। বরঞ্চ জগৎ ও জগতের সবকিছুর সৃষ্টি ও পরিচালনা আল্লাহ তায়ালা 'নিয়ম ও সূত্রে'র আলোকেই করেন। কুরআন শরিফে স্পষ্টভাবে আছে, মানুষকে রিযিক কেউ নয়, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দিয়ে থাকেন। কোন কোন বোকা মনে করে, আল্লাহ অলৌকিকভাবে তার রিযিকের ব্যবস্থ করে দেবেন। কিন্তু অলৌকিকভাবে নয়, আল্লাহ রিযিকের ব্যবস্থা করেন 'নিয়ম ও সূত্রে'র আলোকেই। সুরা ফাতিরের ৪১ নং আয়াতে আছে, আল্লাহ তায়ালা আসমান-যমিনকে পতন থেকে ধরে রাখেন। এর অর্থ এটা নেয়া বোকামি, আল্লাহ অলৌকিকভাবে তা ধরে রাখেন। বরং অর্থ হল, আল্লাহ 'নিয়ম ও সূত্রে'র বিধিবদ্ধতায় তা ধরে রাখেন।

তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা পাহাড়-পর্বতকে ভূমিতে নিক্ষেপ করেছেন অলৌকিকভাবে নয়; 'নিয়ম ও সূত্রে'র মাধ্যমে। প্রথম ও দ্বিতীয় সুরতে কোন 'নিয়ম ও সূত্র' কাজ করে না। তাই কুরআনের ওপর তা চাপিয়ে দেয়া উচিৎ হবে না। অতএব তৃতীয় অর্থটিই উদ্দেশ্য নিতে হবে; আল্লাহ তায়ালা 'নিয়ম ও সূত্রে'র আলোকে ভূগর্ভ থেকে পাথর ও মাটি ওপরের দিকে নিক্ষেপ করে তৈরি করেছেন পাহাড়-পর্বত।

ইউশা রুমান কথা বলছিল, ইতোমধ্যে মাতুব্বর, কিং, চিংকু রাকিবসহ অনেকেই এসে উপস্থিত। তারা ইউশার কথার সিংহভাগ শুনতে পেয়েছিল।

أَلقى শব্দের অর্থ, ওপর থেকে কোন কিছু নিচের দিকে নিক্ষেপ করা। কোন কিছু ভূমিতে ছুঁড়ে মারা। তা হলে কুরআন বলছে, পাহাড়কে ওপর থেকে নিচের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এসব আদিম মানুষের কল্পনা মাত্র। আপনারা কুরআনকে বাঁচাবার জন্য কত অপব্যাখ্যার আশ্রয় না নিচ্ছেন! আক্রোশভরা কণ্ঠে 'বাণীগুলো' উদ্গিরণ করল কিং।

এই কিংয়ের সাথে আপনাদের একটু পরিচয় করিয়ে দিই। তার সাথে ইউশার যখন প্রথম দেখা হয় সে জানায় তার নাম শাহজাহান। ইউশা তখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি জান তোমার নামের কী অর্থ? সে মাথা নেড়ে নাসূচক উত্তর দিল। ইউশা বলল, তোমার নামের অর্থ 'কিং অভ দা ওয়ার্ল্ড'। বিস্ময়ে তার চোখ ছানাবড়া। আনন্দে বলে ফেলল, আমি কিং অভ

দা ওয়ার্ল্ড! ইউশা বলল, আরে, কিং অভ দা ওয়ার্ল্ড তুমি না বরং তোমার নাম। সেদিন থেকে শাহজান নিজেকে কিং বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। কেউ পুরো নাম জানতে চাইলে বলে, আমি কিং অভ দা ওয়ার্ল্ড, বিশ্বের বাদশা। লোকজন তখন তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকায়। সে জিজ্ঞেস করল, তা হলে শাহপরান অর্থ কী? শাহপরান অর্থ, 'ওয়ার্ল্ড বিলাভ্‌ড' বা 'বিশ্ব প্রেমাস্পদ'। সে হাসল, ইউশা কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, তার বড় ভাইয়ের নাম, শাহপরান। কিন্তু তার যে মন্দ আচরণ, কেউ তাকে ভালবাসে না।

ইউশা বলল, নাস্তিকেরা আরবিভাষায় অভিজ্ঞ না হয়ে কুরআন মাজিদের ওপর আপত্তি করে, তুমিও এর বাস্তব প্রমাণ। কুরআন মাজিদে সুরা ইনশিকাকের 4 নং আয়াতে আছে وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ। এখানে মহাপ্রলয়ের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ, সেসময় ভূমি তার ভূগর্ভস্থ জিনিস নিক্ষেপ করবে এবং শূন্য হয়ে যাবে। এই আয়াতে নিচের থেকে ওপর দিকে নিক্ষেপ করা ছাড়া إلقاء শব্দের অন্য কোন অর্থ নেয়া অসম্ভব। বল, إلقاء শব্দের আলোচ্য অর্থ কুরআন মাজিদেই আছে, না আমরা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিচ্ছি?

ইউশার উত্তর শুনে কিং লাজবাব। তাকে চুপ থাকতে দেখে উপস্থিত লোকেরা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কিং নিজেকে সামলে নিয়ে ঝটপট আরেকটি প্রশ্ন করে বসল–আপনারা বলেন, কুরআনে পাহাড়কে বলা হয়েছে পেরেক। বরং মুহাম্মাদেরও শত বছর আগ থেকে আরবে এমন কথার প্রচলন ছিল। মুহাম্মাদ সেই কথাটাই কুরআনে সৃষ্টিকর্তার নামে চালিয়ে দিয়েছে। যেমন: ইবনে কাছিরের 'বিদায়া-নিহায়া'য় আছে, একবার কা'ব বিন লুআই কুরাইশদের ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিল,

والارضُ مِهَادٌ، والسَّمَاءُ بِنَاءٌ، والجِبَالُ أَوْتَادٌ

কা'ব বিন লুআই, যে–মুহাম্মাদেরও পাঁচশ' বছর আগের, সেই তো বলছে, পাহাড় পেরেক, পৃথিবী বিছানা, আকাশ বিল্ডিং। এ কথাগুলোই আছে কুরআনে। সুতরাং পাহাড়কে পেরেক বলার ক্ষেত্রে কুরআনে কোন অলৌকিকতা নেই। ডার্ক এইজে আরবে যা প্রচলিত ছিল, মুহাম্মাদ তা-ই কপি করে দিয়েছে কুরআনে।

কিংয়ের প্রশ্নে অন্যান্য নাস্তিকেরাও অবাক। তার কথায় তারাও একটু নড়েচড়ে বসল। কিং নিজেকে এবার অপরাজেয় ভাবল। তাই ইউশার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকল।

হ্যা, তোমার কথাটি 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া'য় ২য় খণ্ডে, ৩০২ নং পৃষ্ঠায় আছে। তুমি কি জান, ইবন কাছির 'বিদায়া-নিহায়া'য় কোন বই থেকে এনেছেন কথাটি? ইউশার প্রশ্ন।

কিং চুপ।

ইবন কাছির কথাটা উল্লেখ করেছেন আবু নুআইমের উদ্ধৃতিতে। আর আবু নুআইমের বর্ণনাসূত্রে রয়েছে ইবনে যাবালা নামক বর্ণনাকারী। সমালোচকদের দৃষ্টিতে সে মিথ্যুক। সুতরাং কা'ব বিন লুআইয়ের নামে যে কথা চালিয়ে দেয়া হচ্ছে, তা মিথ্যা ও অবাস্তব। আরও কথা আছে, কা'ব বিন লুআই মারা গেছে, যে লোক আলোচ্য কথাটি তার নামে চালিয়ে দিচ্চে তারও অন্তত পাঁচশ' বছর আগে। তা হলে এই লোক পাঁচশ' বছর আগের লোকের কথা বর্ণনা করছে কীভাবে?

মানলাম–কুরআনে কথাটি আগের কারও থেকে নকল করা হয়নি। কিন্তু পাহাড়কে পেরেক বলাটা যে ভুল, অস্বীকার করবেন কীভাবে? প্রশ্ন করল চিংকু রাকিব।

এই চিংকু রাকিব একবার একমুসলিম পণ্ডিতকে বলেছিল, কুরআনে অনেক অবাস্তব কথা আছে। যেমনঃ কুরআনে আছে, 'লোহে মাফুজে' নাকি পৃথিবীর সবকিছু লেখা আছে। আশ্চর্য, আমিও যদি আমার জীবনের কাহিনীসমূহ এক এক করে লিখতে আরম্ভ করি, বিশাল বড় বড় কয়েক আলমারি ভরে যাবে। অথচ 'লোহে মাফুজে' নাকি লেখা আছে ' বিশ্বের সবকিছুর সবকিছু'?

মুসলিম পণ্ডিত তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বৎস, তুমি তোমার জীবনের যে কাহিনীমালা লিখবে, কোত্থেকে লিখবে?

কেন, আমার স্মৃতি থেকে!

তোমার স্মৃতি কি বিশাল বড় বড় আলমারির মতই বিশাল?

না।

সেই ছোট্ট স্মৃতিখানায় তোমার জীবনের সবকিছু সংরক্ষিত থাকতে পারলে, আল্লাহপাক কেন পারবেন না সৃষ্টিকুলের সব ক্রিয়াকর্ম লাওহে মাহফুজে সংরক্ষণ করতে?

ইউশা বলল, আঠার শতক আগে বিজ্ঞানীরা জানত না, পাহাড় সৃষ্টি হয় কীভাবে। সেসময় তারা কল্পনাও করতে পারেনি, দৃশ্যমান অংশের মত পাহাড়ের রয়েছে অদৃশ্য অংশও। ধীরে ধীরে বিজ্ঞান আরও উন্নতি করল। বিজ্ঞানীরা জানল, ভূঅভ্যন্তরেও রয়েছে পাহাড়ের বিরাট অংশ।

নো। নো। ইট'স ইম্পসিবল। আপনি এসব বানিয়ে বলছেন।

USGS–র ওয়েবসাইটে ৩১/১০/২০১৩–এ Mountains Have Thick Crustal Roots শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। প্রবন্ধটিতে আছে–

It's now known that most mountain ranges are underlain by crustal roots floating atop the hot plastically deforming mantle. [১৬]

বর্তমানে জানা বিষয় যে, অধিকাংশ পর্বত শ্রেণির রয়েছে ভূঅভ্যন্তরে গ্রোথিত খ্রাস্টাল শিকড়, যা উত্তপ্ত ম্যান্টল–এর ওপর ভাসমান।

কথা শেষ না করতেই অপরিচিত একজন বলে উঠল, আপনি আমাদের বলবেন পাহাড়ের কথা। কিন্তু খ্রাস্টাল, ম্যান্টল এ সব কী?

খ্রাস্টাল, ম্যান্টল পঙ্খিরাজ ঘোরা কিংবা মৎস্যকন্যার মত কোন কল্পকথা নয়। ভূঅভ্যন্তরের কয়েকটা স্তরের নাম।

শামসুর রহমান তখন বলে উঠল, বাহ, আপনাকে তো ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। কী অদ্ভুত মানুষ আপনি! একটিমাত্র বিজ্ঞান সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে এমন একটি জটিল বিষয় সুরাহা করতে চাইছেন? তারা তো ভুলও করতে পারে।

---

[১৬]https://walrus.wr.usgs.gov/infobank/programs/html/school/moviepage/06.01.23.html

আমি কথা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কথার মাঝেই তুমি প্রশ্ন করে বসেছ। সে যাক তুমি বললে, ভূঅভ্যন্তরে পাহাড়ের বিরাট অংশ রয়েছে, এধারণাটা ভুল হতে পারে। মূলত এথিওরিটি ভুল নয়। একসময় তা আজগুবি ও কাল্পনিক মনে করা হত। বর্তমানে তা কাল্পনিক নয় বরং প্রমাণিত সত্য। আমি আরও উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত Department of GeoScience, University of Wisconsin-Madison–র ওয়েবসাইটে Underneath the mountains শিরোনামে একটি দীর্ঘ গবেষণা প্রকাশিত হয়। এতে আছে–

The most important point is that mountains have buoyant roots that extend downward into the mantle beneath a mountain range, and that the roots are, in general, about 5.6 times deeper than the height of the range.[১৭]

পর্বতশ্রেণির রয়েছে ভাসমান শিকড়, যা পর্বতশ্রেণির নিম্নদেশে ম্যান্টল স্তরের নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত। শিকড়সমূহ সাধারণত পাহাড়ের উচ্চতার চেয়ে প্রায় ৫.৬ ভাগ গভীর।

এতকিছু শোনার পরও মাতুব্বরের আত্মায় প্রশান্তি আসেনি। সে বলে উঠল, বিজ্ঞানীরা তো আর মুহাম্মাদের মত পাহাড়কে পেরেক বলেননি। তারা কেনই বা বলবেন? পেরেক তো গাড়া হয় ওপর থেকে, কিন্তু পাহাড় তো আর ওপর থেকে গাড়া হয়নি?

তার প্রশ্ন শুনে ইকবাল, শরিফ, রাজিবসহ অনেকে হ্যাঁ, হ্যাঁ বলতে লাগল। তাদের মুখের অভিব্যক্তি যেন এমন, এবার বুঝবে চান্দু মাতুব্বরের প্রশ্নে ধার ও ভার কেমন!

ইউশা নিশ্চিন্তে বলতে লাগল, André de Cayeux de Senarpont একজন ফরাসি জিওলজিস্ট। জন্ম–২৪/১২/১৯০৭, মৃত্যু–২৭/১২/১৯৮৬। Anatomy of the Earth নামে বিখ্যাত একটি

---

[১৭] http://geoscience.wisc.edu/~chuck/Cl...mtn_roots.html

গ্রন্থ রয়েছে তার। গ্রন্থটিতে তিনি লেখেন– the mountains like page Have deep roots embedded in the ground. Thes roots are deeply embedded in the ground. Thus mountains have a shape like peg.

এই বিজ্ঞানী বলছেন, পেরেকের মত পাহাড়ের রয়েছে ভূঅভ্যন্তরে গ্রোথিত শিকড়। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা পাহাড়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন 'পেরেক' শব্দ!

মাতুব্বর! তোমাকে জিজ্ঞেস করি, এই বিজ্ঞানী পাহাড়কে পেরেক বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন, পেরেক যেমন ওপর থেকে গাড়া হয়, পাহাড়ও তেমনি ওপর থেকে গাড়া?

অফকোর্স নট।

ঠিক বলেছ। এর অর্থ এ নয় যে, তারা বোঝাতে চাইছেন, পাহাড় পেরেকের মত ওপর থেকে গাড়া হয়েছে বরং তাদের উদ্দেশ্য, পেরেকের যেমন বেশি অংশ অভ্যন্তরে থাকে। তেমনি পাহাড়ের বেশি অংশ রয়েছে ভূঅভ্যন্তরে। তো কুরআন মাজিদে এটাই বোঝানো হয়েছে। তোমরা যা বুঝছ তা নয়।

তোমাকে আবার জিজ্ঞেস করছি, গাছের কোনটা বড়, কাণ্ড না শিকড়?

কাণ্ড।

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, পাহাড়ের নিচের অংশ ওপরের অংশের চেয়ে বেশি লম্বা। শিকড় শব্দের মাধ্যমে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, মাটির নিচেও পাহাড়ের অংশ রয়েছে। কিন্তু তার যথার্থ পরিমাণ আঁচ করা যায় না। পক্ষান্তরে পেরেক বলার দরুন এই সত্যটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। সুতরাং আমরা বিনা দ্বিধায় এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পবিত্র কুরআনের বর্ণনা বাস্তব তো বটেই, অনেক সূক্ষ্ম ও অর্থবহুলও।

মহাবিশ্বে ধোঁয়া

পবিত্র কুরআনে আছে,‘আল্লাহ অভিমুখ হলেন আকাশের দিকে, তখন আকাশ ছিল ধোঁয়াপূর্ণ।’ মহাবিশ্বে ধোঁয়া; কথাটি কেমন অদ্ভুত! হ্যা, অদ্ভুত হওয়ার কারণেই কুরআন বিদ্বেষীরা চ্যালেঞ্জ করে আসছিল; কথাটি ভুল। ওপরের দিকে তাকালে ধোঁয়ার মত কিছু দেখা যায়, তাই মুহাম্মাদ বলে দিয়েছে মহাকাশে আছে ধোঁয়া। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ ভুল। মহাবিশ্বে আছে, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম-জাতের বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ। কুরআন রচয়িতা এসব জানবে কীভাবে, মুহাম্মাদ তো ছিল মরুভূমির মেষপালক! বলো,

জয়! বিজ্ঞানের জয়!!

জয়! নাস্তিকতার জয়!!

ইউনিভার্সিটির বিরতিতে ইউশা, নাসর, রিচার্ড গাজীপুরের উদ্দেশে রওনা হয়। গাজীপুরের যে নামডাক, মনে হয়, গাজীপুর ঢাকার মতই ঘনবসতিপূর্ণ গাছপালাহীন শহর। কিন্তু গাজীপুরে এসে মাইলের পর মাইল প্রশস্ত নিবিড় অরণ্য, দানবীয় গাছগাছালি দেখে তার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। কিছু কিছু এলাকা একেবারে অজপাড়া গাঁয়ের মত। এফএম রেডিওগুলোর ভূতের আড্ডায় গাজীপুরের উল্লেখ তা হলে যথার্থ। নাস্‌র (তার ফেইসবুক আইডি: আইনস্টাইনের নাতি) হঠাৎ বলে উঠল, সাবধান, ওদিকে যাস নে। নিউটনের মাথায় তো পড়েছিল আপেল, কিন্তু আমাদের মাথায় যদি পড়ে ওসব তালগাছের কোন একটি তাল, তা হলে মস্তক মশায় থেকে 'মহাকর্ষ' তত্ত্ব বেরোবে না, বেরোবে মহাকর্ষ তত্ত্ব ভাববার মস্তিষ্ক।

ইউশা বলল, নাতি! নিউটনের মাথায় আপেল পড়েছিল, সেখান থেকেই তার মাথায় মহাকর্ষ তথ্য আবির্ভূত হয়েছিল, কথাটা ভিত্তিহীন। তুমি আধুনিক যুগের অন্যতম জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং লিখিত A Brief History of Time গ্রন্থে শুরুর দিকেই কথাটি পেয়ে যাবে। তদুপরি স্যার আইজাক নিউটনের নির্ভরযোগ্য জীবনচরিতসমূহে এই 'আপেল তত্ত্বে'র দেখা মেলে না।

এখন তারা একটি হোটেলে। আগামীকাল আরও অনেক দর্শনীয় স্থানে যেতে হবে বিধায় রাতের খাবার শেষ করে তারা বিশ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। রিচার্ড বলে ওঠে, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তারপর যা ইচ্ছা হয় কর।

কুরআনে আছে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুর দিকে ঈশ্বর মহাবিশ্বে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিলেন। আর সেই ধোঁয়া দিয়েই নাকি তিনি মহাকাশ তৈরি করেছিলেন। কেমন অযৌক্তিক ও বিজ্ঞান বিরোধী কথা না! সেই সময় ধোঁয়া আসবে কোত্থেকে? কোনো গ্রহে আগুন লেগেছিল নাকি? বিজ্ঞান সম্পর্কে যার সামান্য জানাশোনা আছে, সেও বলতে পারবে, মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে।

আইনস্টাইনের নাতি ইউশার দিকে তাকাল। তার বিরাট সন্দেহ ইউশা প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর দিতে পারবে কিনা। কিন্তু ইউশাকে লেপটপ ওপেন করতে দেখে তার মনে হল, উত্তর দেয়ার অনেক কিছুই হয়ত বা আছে ইউশার।

ইউশা বলতে লাগল, সন্দেহ নেয়, সৃষ্টির সূচনায় বিশ্বে হাইড্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস ছিল। কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগের বিপুল সংখ্যক ধুলা আবিষ্কার করেছে। তারা ধারণা করতে পারেনি, সৃষ্টির সূচনায় বিশ্ব এত ধূলিময় থাকবে। মহাবিশ্বের দিকে তাকালে বিজ্ঞানীদের কাছে মনে হত মহাবিশ্বটা মহাজাগতিক ধুলায় পূর্ণ। তারা যখনি কোন মেঘ আবিষ্কার করত, ভাবত এই মেঘ মহাজাগতিক ধুলার অণুগঠিত। কিন্তু মহাকাশ-গবেষণায় তারা যখন আরও উৎকর্ষ সাধন করল এবং সেসব মেঘের অংশবিশেষ পৃথিবীতে এনে গবেষণা করল তখন তাদের গবেষণার ফল কী দাঁড়াল? তাদের গবেষণাকর্মের পর্যবেক্ষকের অভিমত হল ‘এসব মেঘমালাকে যে আমরা মহাজাগতিক ধুলা বলে নাম করণ করতাম তা কিন্তু কিছুতেই ধুলা সদৃশ না, যদি এসব মেঘমালার বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করি তা হলে সর্বোত্তম শব্দ হবে ধোঁয়া।’

না। না। মহাজাগতিক ধোঁয়া বলতে কিছু নেই। কুরআনকে যারা বৈজ্ঞানিক ভুল থেকে বাঁচাতে চায়, এটা তাদের আবিষ্কার করা মিথ্যাচার। আপত্তি করল রিচার্ড।

ইউশা বলল, এসব আমাদের আবিষ্কার নয়। আর মিথ্যাচার তো নয়ই। তোমাদের এটা মস্ত বড় সমস্যা, না জেনেই অনেক কিছু না করে দাও। আমি তোমার সামনে বর্তমান বিজ্ঞানীদের গবেষণা তুলে ধরছি।

European Space Agency কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত Herschel Space Observatory এর বিজ্ঞানীরা লিখেন–

The Universe is a very dusty place. Cosmic dust consists of tiny particles of solid material floating around in the space between the stars. It is not the same

as the dust you find in your house but more like smoke[১৮]

উদ্ধৃতিটি সরাসরি Herschel Space Observatory-র ওয়েবসাইট থেকে নেয়া। তো মহাকাশ গবেষকেরা বলছেন, মহাবিশ্ব খুবই বালুকাময় ও ধূলিধুসরিত স্থান। কঠিন পদার্থের ছোট কণিকাগঠিত মহাজাগতিক ধূলি তারকাসমূহের মাঝে শূন্যে ভাসমান। এসব সেই ধূলিকণা নয় যা তুমি তোমার গৃহে পেয়ে থাক, বরং অনেকটাই ধোঁয়ার মত।

নাতির চোখে ঘুম। বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। কিন্তু 'এসব সেই ধূলিকণা নয় যা তুমি তোমার গৃহে পেয়ে থাক, বরং অনেকটাই ধোঁয়ার মত' কথাটি তার কানে পড়তেই নড়েচড়ে বসল। বলল, দোস, দোস, কী যেন বলছিলে? একটু রিপিট কর দেখি।

ইউশা কথাটি আবার বলল।

নাতি চোখ বড় বড় করে তাকায়। বিজ্ঞানী না হলেও আইনস্টাইনের নাতি তো, বিজ্ঞান জানতে খুব আগ্রহী। বলল, এবিষয়ে আর কী জান, বল। তাড়াতাড়ি বল।

০৭/১৭/২০০৩ তারিখে univers today এর ওয়েবসাইটে Supernovae Produce Dust More Efficiently than Previously Thought শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে বলা হয়–

We have just discovered that some supernovae have bad habits–they belch out huge quantities of smoke, known as cosmic dust. This solves a long-standing mystery over the origin of cosmic dust and suggests that supernovae, which are exploding stars, were responsible for producing the first ever solid particles in the Universe.[১৯]

---

১৮ http://herschel.cf.ac.uk/science/infrared/dust

19 http://www.universetoday.com/8716/supernovae-produce-dust-more-efficiently-than-previously-thought/

অর্থাৎ, বিজ্ঞানীরা মাত্র কয়েকদিন হল, আবিষ্কার করতে পেরেছে, সুপারনোভা বা তারকা বিস্ফোরণ বিপুল পরিমাণে ধোঁয়া উদ্গিরণ করে। যে ধোঁয়া মহাজাগতিক ধুলা হিসেবে পরিচিত। এটা মহাজাগতিক ধুলার উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি দীর্ঘস্থায়ী রহস্য উন্মোচন করছে যে, এসব তারকা বিস্ফোরণই মহাবিশ্বের প্রথম কঠিন কণিকার উৎপত্তির জন্য দায়ী।

২৪/০৭/২০০৩ তারিখে science daily-র ওয়েবসাইটে Smoking Supernovae: Astronomers Claim Solution to a Mystery of the Universe শিরোনামে উল্লেখ করা হয়–

Cosmic dust consists of tiny particles of solid material floating around in the space between the stars. It is not the same as house dust but more akin to cigarette smoke. ... The presence of dust grains around young stars helps them to form and they are also the building blocks of planets.[২০]

কারডিফ ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে, মহাজাগতিক ধুলা মূলত ধুলা নয়। বরং অনেকটাই সিগারেটের ধোঁয়ার মত। 'তরুণ' তারকামালার চারপাশে এসব ধুলার উপস্থিতি সেসবের গঠনে সহায়তা করে। তদুপরি সেসব ধুলা গ্রহসমূহের বিল্ডিং ব্লকও।

০১/২০/২০০৯ তারিখে the university of Manchester-র ওয়েবসাইটে New light on origins of universe শিরোনামে প্রকাশিত গবেষণাপ্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়–

Dust plays a key role in the evolution of galaxies such as our Milky Way, and is the building block for the formation of planets.

Stars produce dust–smoke-like particles rich with carbon or oxygen – as they die. But less is known

২০ https://www.sciencedaily.com/releases/2003/07/030723084654.htm

about how and what kind of dust was created in the first galaxies as they formed soon after the Big Bang.[২১]

মহাজাগতিক ধুলা আমাদের ছায়াপথসহ অন্যান্য ছায়াপথ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং গ্রহসমূহের গঠনে বিল্ডিং ব্লকরূপে কাজ করে। তারকারা যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তা জন্ম দেয় ধুলার–কার্বন বা অক্সিজেনসমৃদ্ধ ধোঁয়া-কণিকার। বরং খুবই কম জানা আছে, কীভাবে এবং কতটুকু ধুলা মহাবিস্ফোরণের পরপরই গঠিত প্রথম গেলাক্সিসমূহের সময় সৃষ্টি হয়েছিল।

www.nasa in arabic.net–এ ‘মহাজাগতিক ধোঁয়ার পেছনে লুকিয়ে আছে কৃষ্ণ গহবর’ শিরোনামে একটি গবেষণাপ্রবন্ধ রয়েছে।

বল রিচার্ড, বিজ্ঞানীদের এসব গবেষণার মাধ্যমে আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি?

তুমিই বল।

এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, মহাবিশ্বের সর্বত্রই মহাজাগতিক ধোঁয়া রয়েছে, যা গ্রহ ও ছায়াপথ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মহাবিস্ফোরণের পরপরই দেখা দেয় এসব ধোঁয়া। তা হলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, মহাকাশ ‘তৈরি’র সময় বিপুল পরিমাণে ধোঁয়া ছিল। ছায়পথ ও গ্রহসমূহ গঠনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

বল, কুরআনে যে বলা হয়েছে মহাকাশ তৈরির সময় মহাবিশ্বে ধোঁয়া ছিল, কথাটি কি ভুল?

রিচার্ডকে অফ থাকতে দেখে আইনস্টাইনের নাতি অন হয়ে গেল। রিচার্ড, বল। জবাব দাও ।

আই এম ইক্সট্রিমলি সরি, বাট আই হেভ মোর কুয়েশচানস। বলল রিচার্ড।

---

২১ http://www.manchester.ac.uk/aboutus/news/display/?id=4312

আমি কুরআন মাজিদের একজন নগণ্য খাদিম, অলহামদুল্লিাহ। কুরআন সম্পর্কে আমি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত। বল, তোমার আর কী প্রশ্ন।

ইউশা দেখল, নাস্‌র মোবাইল অন করে রেকর্ড করতে প্রস্তুত। তাকে বেশ প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে। একজন সহপাঠীর প্রতি আরেকজন সহপাঠীর এরকম আস্থা ও ভক্তি সত্যিই বিরল।

কুরআনে আছে 'আমি আকাশকে বানিয়েছি বিনা'। আমি কয়েকটি ডিকশনারিতে শব্দটির অর্থ খুঁজেছি। দেখি 'বিনা'র অর্থ হল, বিল্ডিং, ভবন। আচ্ছা, ইউশা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বল তো আকাশ কি ভবন? আকাশ কি বিল্ডিং? মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন সব অদ্ভুত কথা শুধু কুরআনেই দেখতে পাওয়া যায়। আমার আরও প্রশ্ন আছে। কিন্তু আমি মনে করি, কুরআন বিজ্ঞান বিরোধী; এবাস্তবতাটা বোঝাবার জন্য এই উদাহরণটিই যথেষ্ট।

নাসের, দোস্ত, একটু পানির ব্যবস্থা করবে?

একটু কেন, দরকার হলে পুরো ট্যাংকি নিয়ে আসব না! নাসরের সহাস্য জবাব।

রিচার্ডের মুখে আনন্দের ছাপ;তার প্রশ্ন শুনে উৎকণ্ঠায় ইউশার গলা শুকিয়ে গেছে বলে সে ধরে নেয়।

ইউশা বলতে শুরু করল, আমাদের মনে রাখতে হবে, কুরআন কারিম বাইবেল, বেদ, ত্রিপিটক–জাতীয় ধর্মগ্রন্থ নয়, যেসবে অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা রয়েছে বিপুল পরিমাণে। কারণ সেসব গ্রন্থের কোনটা মৌলিকভাবে ঐশ্বরিক গ্রন্থ হলেও বর্তমানে তার কোনটাই ঐশ্বরিক গ্রন্থ নয়। সবগুলোই মারাত্মকভাবে বিকৃত। পক্ষান্তরে কুরআন মাজিদ অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত আছে অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকেই। কুরআন কারিমের ১৫ নাম্বার সুরার ৯ নাম্বার আয়াতে আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমরাই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই তা সংরক্ষণ করবো।' তাই কুরআন কারিম সর্ববিবেচনায় সঠিক ও নির্ভুল। সব ধরণের ভুল থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত। সাময়িকভাবে তাতে কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে চিন্তিত হবার কারণ নেই। আবার কারো খুশিতে আটখানা হওয়াও উচিৎ নয়। কারণ জ্ঞানের স্বল্পতার দরুনই কুরআনে অসঙ্গতি আছে বলে ভ্রম হয়। পক্ষান্তরে

জানাশোনার পরিধি যখন বিস্তৃত হয় তখন ঠিকই কুরআন কারিমের বর্ণনা অলৌকিক হয়ে আমাদের সামনে সমুদ্ভাসিত হয়।

এখানেও ঠিক তা–ই হয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করত, গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি ছাড়া বিশ্বটা শূন্য। কিন্তু তারা মহাবিশ্ব-গবেষণায় যখন আরও উৎকর্ষ লাভ করল তারাই তাদের ভুল ধরতে পেরে বলে উঠল, মহাবিশ্বটা শূন্য নয়।

'মহাবিশ্বটা শূন্য নয়' কথাটা শুনে রিচার্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ল। আশ্চর্য তো, মহাবিশ্বে শূন্যতা নেই মানে? তুমি বিজ্ঞান বানাচ্ছ নাকি? এসব বললে আমি কিন্তু তোমার আর কোন কথাই শোনব না।

ধীরে বন্ধু! ধীরে। 'ডার্ক মেটার', 'ডার্ক এনার্জি' সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আগে কিছুই জানত না। তারা মনে করত, তারকা, গ্রহউপগ্রহ ছাড়া মহাবিশ্বে যে 'শূন্যতা' দেখায়, তা আসলেই শূন্য। কিন্তু এসব জানার পর তারা বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল। সাগরের ধূলিকণার মত কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি... তারকা, গ্রহউপগ্রহ ছাড়া মহাবিশ্বে আরও পদার্থ আছে! বিজ্ঞানীরা দেখল, মহাবিশ্বে দৃশ্যের চেয়ে অদৃশ্য শক্তি তিন-চতুর্থাংশ বেশি। তখন তারা অনুধাবন করল, মহাবিশ্বটা শূন্য নয়।

শোন রিচার্ড, কুরআন তার স্বমহিমায় সর্বদা সমুজ্জ্বল। অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে যুগে যুগে তা শত শত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে আসছে। 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানে'র নামধারীরা সব যুগে তার বিরোধিতা করেছে এবং করে যাচ্ছে। কিন্তু কুরআন সব সময়ই তাদের মুখে চপেটাঘাত করে আসছে এবং চোখে আঙুল দিয়ে তাদের ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে। কুরআনে আছে, 'তারা কি আকাশের দিকে তাকায় না, কীভাবে আমি তা বানিয়েছি, এবং তা সুসজ্জিত করেছি, আর তার মধ্যে নেই কোন ছিদ্র, ফাঁক।' কুরআনে 'ফুরুজ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা 'ফার্‌জ'-র বহুবচন। এর অর্থ, ছিদ্র, ফাঁক, শূন্যতা। তো কুরআনে বলা হয়েছে, আকাশে কোন ফাঁক নেই। তোমরা যারা বিজ্ঞান কিছু বলার আগেই বলে দাও অমুক জিনিসটা বিজ্ঞান বিরোধী–তোমরা এই বক্তব্য সম্পর্কে কী বলতে? বলতে, দেখ। দেখ, কুরআন কী আজগুবি কথা শোনাচ্ছে–মহাবিশ্বে ফাঁক, শূন্যতা নেই। বিজ্ঞান Space শব্দ ব্যবহার করছে আর কুরআন বলছে Space নেই। ছুঁড়ে ফেল এসব ধর্মগ্রন্থ। বরং

বিজ্ঞানের আলোয় নিজেদের আলেকিত কর। বল রিচার্ড, তোমরা এমনটা বলতে কিনা?

রিচার্ডকে চুপ থাকতে দেখে নাসর বলে উঠল, হ্যাঁ। হ্যাঁ। অবশ্যই বলত।

প্রখর রোদে মরুভূমির পানিশূন্য পথিক যেমন উন্মুখ থাকে একপশলা বৃষ্টির, সত্যের সন্ধান পেতে যার হৃদয় থাকে এমন উন্মুখ, তার চোখ খুলে যাওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনের এমন একটি আয়াতই যথেষ্ট। কুরআনের রচয়িতা যদি মহাজগতের স্রষ্টা আল্লাহ পাক না হতেন, তা হলে এমন বক্তব্য কুরআনে বর্ণিত হত না। কখনও হত না। কস্মিনকালেও হত না।

শুধু তাই নয়, কুরআনে বলা হয়েছে, আকাশ হল ভবন। 'আকাশ ভবন! শুনছ? তোমরা শুনছ, আকাশ নাকি ভবন? হা হা হা।'

আমি করজোড়ে নিবেদন করে বলতে চাই। কুরআনের প্রতি তোমার এত উপহাস কেন? মহাকাশ কেন ভবন হতে পারে না? বিজ্ঞানের কোন সূত্রের আলোকে তুমি ঘোষণা করছ মহাকাশ ভবন হতে পারে না? তুমি কি মহাকাশের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সবদিকের শেষ সীমানা চিহ্নিত করতে পেরেছ? তুমি কি মহাকাশের বাইরে গিয়ে মহাকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছ মহাকাশ দেখতে কেমন? দেখনি। দেখনি। দেখনি।

তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছ, ভবনের যেরকম অকটা অংশ আরেকটা অংশের সাথে সংযুক্ত, তেমনি মহাকাশের পদার্থসমূহ পরস্পর সংযুক্ত? একটা আরেকটা থেকে পৃথক, বিচ্ছিন্ন নয়? তুমি ভাবনি। ভাবনি। ভাবনি। তা হলে কুরআনের মহাকাশকে ভবন বলাটা ভুল ও অবৈজ্ঞানিক হয় কীভাবে? কোন জিনিস অবৈজ্ঞানিক হওয়ার জন্য সে বিষয়ে বিজ্ঞানের উপস্থিতি আবশ্যক। বিজ্ঞান না থাকতে কোন বিষয়কে অবৈজ্ঞানিক যারা বলে, ওরা চরম স্বার্থবাজ, ধোকাবাজ। এসব বলে বলে 'অনুসরণীয়' ও 'তারকা' হয়ে ওঠে যারা, ওরা মানবতার ঘোর শত্রু।

কথাগুলো বলে ইউশা চুপ করল। আরেক গ্লাস পানি দেবে নাসর?

চায়ের ব্যবস্থা করব?

করলে ভালো হত। কিন্তু এত রাতে চা পাবে কোথায়?

ইউশা আবার বলা শুরু করল। কুরআনকে যারা ভুল বলে, ওরা মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণেই বলে। এদের ব্যাপারেই আল্লাহ বলেন, ‘বরং তারা না জানার দরুন মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে’। মহাকাশটা ভবন। অবশ্যই ভবন। আমি এটা বিশ্বাস করি, কারণ কুরআন এমনটি বলছে। বিজ্ঞান কী বলছে, তা আমার লক্ষণীয় বিষয় নয়। হ্যাঁ, বিজ্ঞান যদি নির্ভুল হয় তা হলে অবশ্যই তা কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। কারণ কুরআন কারিম আল্লাহর বাণী। এর আছে স্বচ্ছ, নির্ভুল ইতিাস। পক্ষান্তরে অন্যসব ধর্মগ্রন্থ কবে, কখন, কীভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তার নিশ্চিত ও নির্ভুল প্রমাণ নেই। বরং ওসব ধর্মগ্রন্থের বেশির ভাগ হল ধর্মগুরুদের বাণী ও তাদের চিন্তাধারা। ফলে ওসবে থাকে অযৌক্তিক, অবাস্তব ও বিজ্ঞান বিরোধী কথা। এটা অনস্বীকার্য বাস্তবতা, কেউ যদি তেড়ামি ও ঘাউড়ামি করে বলে, না। বরং ও-সব শতভাগ ঐশ্বরিক গ্রন্থ, তা হলে তাকে লড়তে হবে প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরুদ্ধে। আর কোন গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরুদ্ধে যাওয়া প্রমাণ করে তা ঐশ্বরিক গ্রন্থ নয়।

বিল্ডিং-ভবনের যে ভাব ও মর্ম, তা মহাকাশে বিদ্যমান। বিজ্ঞানীরা ইদানিং মহাকাশের গ্যালাক্সি ইত্যাদিকে ‘মহাজাগতিক ভবনের নির্মাণপাথর’ বলে আখ্যায়িত করা শুরু করেছে। যেমন তারা বলছে, The first galaxies or rather the first galaxy building blocks will form inside the threads of the web.

প্রাথমিক গ্যালাক্সিসমূহ বা আরও উপযুক্ত শব্দে গ্যালাক্সি জাতীয় (মহাজাগতিক) ভবনের প্রাথমিক ইটসমূহ অদূর ভবিষ্যতে (মহাজাগতিক) জালের সুতোর মাঝে গঠন লাভ করবে। তারা আরও বলছে, One of the most obvious facts about the Universe is that it shows a wealth of structure on all scales from planets, stars and galaxies up to clusters of galaxies and super-clusters extending over several hundred million light years

অর্থাৎ, মহাবিশ্বের ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট বিষয় হল, মহাবিশ্বটা সবদিক থেকেই শত শত মিলিয়ন আলোক বর্ষ বিস্তৃত গ্রহ নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, ক্লাস্টার, সুপার ক্লাস্টার ইত্যাদি নির্মাণকাঠামোয় ভরপুর দেখায়।[২২]

আমরা লক্ষ করলাম, বিজ্ঞানীরা ছায়াপথসমূহকে মহাজাগতিক Building Block এবং Structure বলতে অধিক পছন্দ করছে। আসলে পুরো মহাকাশটাই সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে গঠিত ও নির্মিত। মহাকাশের কোন অংশই অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটা অংশ আরেকটা অংশের সাথে সংযুক্ত। সবকিছুই জালের সুতোর মত পরস্পর মিলিত। যাকে বিজ্ঞানীরা Cosmic web বা Threabs of web হিসেবে ব্যক্ত করে থাকে। তারা বলে থাকে- Scientists say that matter in the Universe forms a cosmic web, in which galaxies are formed along filaments of ordinary matter and dark matte। বিজ্ঞানীরা বলে, মহাবিশ্বের বিভিন্ন পদার্থ মহাজাগতিক সুতারূপে গঠিত। অন্ধকারাচ্ছন্ন পদার্থ ও সাধারণ পদার্থের সুতোগুলো কেন্দ্রকরে ছায়াপথগুলো গঠিত।[২৩]

বর্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এই মহাজাগতিক ভবন শব্দ ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছেন। নাসার বিজ্ঞানীরা এখন ব্যবহার করছে, When Did the First Cosmic Structures Form?[২৪] তারা আরও বলছে, How Did Structure Form in the Univers।[২৫] National Radio Astronomy Observatory-র বিজ্ঞানীরা বলছে, Galactic Building Blocks Seen Swarming around Andromeda[২৬]

---

২২ http://www.kva.se/KVA_Root/files/newspics/DOC_2005217592_1296017045_popcrafoord05eng.asp
http://map.gsfc.nasa.gov/m_uni/uni_101firstobj.html
২৩ http://www.govertschilling.nl/nieuws/archief/2001/0105/010518_eso.htm
24 https://map.gsfc.nasa.gov/universe/rel_firstobjs.html
25 https://map.gsfc.nasa.gov/mission/sgoals_structure.html
26 www.nrao.edu › Press Releases

তো মহাজগতটা যেন একটা ভবন আর বিভিন্ন ছায়াপথ, নক্ষত্র ইত্যাদি মহাজাগতিক ইট-সুরকি ও নির্মাণকাঠামোর কাজ করছে।

ইউশা কথা শেষ করল। আর কোন প্রশ্ন করল না রিচার্ড। রাত তখন একটা ছুঁই ছুঁই। তারা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে জাগল, যখন ফজরের আযানের ধ্বনি তাদের কানে পড়ল। ইউশা আর নাসর সালাতের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারা লক্ষ করল রিচার্ড তাদের ফলো করছে। সেও তাদের মত সালাতের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। তাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না যখন দেখল তাদের সাথে সালাতে এসে শামিল হল রিচার্ড।

আরে রিচার্ড, তুমি এখানে? মশকারি করছ নাকি?

আগে তো সালাত আদায় করতে দাও।

তারা সালাত শেষ করে রিচার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে যাবে। রিচার্ড বলা শুরু করল, আমি...

ইউশার মোবাইল বেজে উঠল। তোমরা কথা চালিয়ে যাও। আমি এক্ষুণি আসছি।

রিচার্ড আবার বল শুরু করল, আমি তো তোমাদের সাথেই ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু রাতের শেষ প্রহরের দিকে স্বপ্নে দেখি, আমি খুব ক্রুদ্ধ। তোমাদের নিরুত্তর করবার জন্যে আমি কুরআন খুলে পাতা নেড়েচেড়ে দেখছি কুরআনে বৈশ্বিক বক্তব্যে কোন অমিল খোঁজে পাই কিনা। হঠাৎ, আমার নজরে পড়ল, একটি আয়াত;'স্মরণ কর সেদিনকে, যেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমনিভাবে লেখক লিখিত কাজগপত্র গুটিয়ে নেয়।'[২৭] আমি খুশিতে আটখানা হয়ে গেলাম। মনে মনে বললাম, এবার তোমাকে দেখে নেব ইউশা! কাগজপত্র যখন কোন টেবিলের ওপর রাখা হয়, তা সমতল থাকে। কুরআন কাগজপত্রের সাথে তুলনা করছে মহাকাশকে। তা হলে মহাকাশ সমতল! হা হা হা, মহাবিশ্ব নাকি সমতল! পৃথিবীর খবর নাই, মহাবিশ্বের খবর দিচ্ছে—মহাবিশ্ব নাকি সমতল। আদার বেপারির জাহাজের খবর বৈকি। আচমকা দেখি ইউশা ভাই আমার সামনে উপস্থিত।

---

[27] সুরা আম্বিয়া,২১/১০৩।

রিচার্ড ইউশাকে কখনও ভাই বলে ডাকেনি। কিন্তু এখন ইউশাকে ভাই বলতে দেখে নাসর আঁচ করতে পারল, ইউশার জন্য ভালো কিছুই অপেক্ষা করছে।

আমি ইউশাকে কিছু বলতে যাব, তখনি তার মোবাইটি হাত থেকে খসে পড়ে। আমি ছিলাম বসা। তাড়াতাড়ি উঠালাম। আমার দৃষ্টি পড়ল মোবাইলে একটি লেখার ওপর। দেখি নাসার ওয়েবসাইট। আরে, তুমি নাসার ওয়েবসাইট দেখ নাকি? দেখি তো কী লেখা আছে এতে? আমি যা দেখলাম তাতে রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, ০১/২০/১৪ তারিখে (আপডেইটেড) নাসার বিজ্ঞানীরা Will the Universe expand forever শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির একস্থানে তারা লিখছেন, the geometry of the universe is flat like a sheet of paper[২৮] অর্থাৎ, মহাবিশ্ব সমতল কাগজপত্রের মত। এ-কি কুরআনের শব্দ! নাসার বিজ্ঞানীরা কুরআন পড়ে না। তা সত্ত্বেও তাদের লেখায় চলে এল কুরআনের উপমা! সত্যিই বড় অদ্ভুত। আমি ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে ইউশার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সে কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। আমি তাকে বিষয়টি খুলে বললাম।

সে বলল, আরে বন্ধু, কুরআনের বিস্ময় তো মাত্র শুরু। আরও কত বিস্ময় অপেক্ষা করছে সত্যসন্ধানীর জন্য!

আরও বিস্ময় দেখতে চাও?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। বল, ভালোই তো লাগছে।

ইউশা রিচার্ডের মুখাবয়বে পরিবর্তনের আভাস লক্ষ করল। সে সোৎসাহে বলতে লাগল, শোন। কুরআনে আল্লাহ শপথ করছেন, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ;'শপথ, পথবিশিষ্ট আকাশের'। তুমি ইবনে জারির তাবারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখ, তিনি ذَاتِ الْحُبُكِ শব্দের অর্থ করছেন, পথবিশিষ্ট। ইবনে জারির তাবারি মৃত্যুবরণ করেছেন, ১০০০-১১০০ খ্রিষ্টাব্দে। তো কুরআন বলছে, আকাশে আছে পথ। এবার শোন, ০১/১০/০৮ তারিখে নাসার

---

[২৮] https://map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_shape.html

ওয়েবসাইটে Violent Lives of Galaxies: Caught in the Cosmic Dark শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। তাতে নাসার বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন–But in our case the city is a supercluster, the roads are dark matter, and the people are galaxies [২৯]

আরও শোন। কুরআনে বিশেষ কিছু তারকাকে আল্লাহ বাতি বলেছেন। তারকা হল বাতি, কেমন স্থূল কথা! ও বুঝেছি, অন্ধকার রাতে তারকাগুলোকে জ্বলতে দেখা যায় তো, তাই বাতি বলে দিয়েছে তারকামালাকে। এতে আবার অবাক হওয়ার কী আছে? এমন কথা তো বলতে পারি আমরাও। এমনসব কথা বলে বাংলার যে সব এরিস্টটলরা কুরআন নিয়ে উপহাস করত, তারা আজ কী বলবে? ২০/০১/২০১৪ তারিখে daily mail উল্লেখ করা হয়, Web of dark matter seen for the first time: Giant 'cosmic flashlight' illuminates hidden network that could help reveal mysteries of the universe[৩০]

অর্থাৎ, প্রথমবারের মত অন্ধকার পদার্থ দেখা যায়। দানবীয় ‘মহাজাগতিক টর্চলাইট’ উদ্ভাসিত করছে এই সুপ্ত জাল, যা মহাবিশ্বের বিদ্যমান রহস্য প্রকাশে সহায়তা করতে পারে।’ প্রবন্ধটিতে দানবীয় কুয়াযার তারকাসমূহকে বলা হয়েছে flashlight। এসব দানবীয় তারকা অত্যন্ত উজ্জ্বল। এসব তারকার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আলোর কারণেই বিজ্ঞানীরা ‘মহাজাগতিক সুতা বা জাল’ চিনতে সক্ষম হয়েছে। আরও শোন। কুরআন মাজিদে...

ইউশাকে আমি থামিয়ে দিলাম। বললাম, যথেষ্ট হয়েছে বন্ধু। আমি বুঝতে পেরেছি, কুরআন উপহাসের নয়, বিস্ময়ের গ্রন্থ। আমাকে একা থাকতে দাও। আমি কুরআনের বিস্ময়ে বিভোর হয়ে থাকতে চাই কিছুক্ষণ।

---

[২৯] https://www.nasa.gov/centers/.../violent_galaxies.html

[৩০] www.dailymail.co.uk/.../Giant-cosmic-flashlight-illuminates-hidden-network-help-reveal...

ইউশা চলে যায়। জানালা দিয়ে রাতের আকাশের মিটিমিটি আলো রুমে আসছিল। আমি আকাশের 'লাইট' দেখতে জানালার দিকে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ, কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম। আর তখনই ঘুম ভেঙে যায়। আমি অবাক হলাম–একি দেখলাম স্বপ্নে! তখন থেকেই মনে হল, আমি নব জীবন লাভ করেছি।

ভ্রমণ শেষে তারা ইউনিভার্সিটিতে চলে আসে।

বিকেলবেলা রিচার্ড তার বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিল। পথের পাশে একটি দোকানে তারা পৃথিবীর বড় একটি গ্লোব দেখতে পায়। গ্লোবটি তারা কিনে নেয়। হাঁটতে হাঁটতে রিচার্ড তাদের বলল, আচ্ছা গ্লোবটি গোলাকার কেন? পৃথিবী গোলাকার হওয়ার কারণে,তাই না?

হ্যাঁ, অবশ্যই। বলল শরিফ।

কিন্তু বাইবেলে আছে, পৃথিবী সমতল ।

শুধু বাইবেলে কেন, কুরআনেও তো তা–ই আছে?

আমি তোমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু। অনেক ধার্মিকের সঙ্গে কুরআন বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ার ব্যাপারে আমরা বিতর্কও করেছি। কিন্তু কোন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে মিথ্যা বলার তো দরকার নেই আমাদের?

আমাকে মিথ্যা বলছ, কুরআনেই তো পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে? সুরা গাশিয়ায় আছে, 'তারা কি পৃথিবীর দিকে তাকায় না, আমি কীভাবে তা সমান করেছি।' এখানে سطح 'সাত্হ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ সমান করা।

আচ্ছা, কুরআন মাজিদে কি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে 'পৃথিবী' দ্বারা কী উদ্দেশ্য; সমগ্র পৃথিবী, না পৃথিবীর অংশবিশেষ?

সমগ্র পৃথিবীটাই? কুরআনে আছে, সমগ্র পৃথিবীটাকে সমতল করা হয়েছে।

রিচার্ড বলল, সুরা বাকারায় আছে, সুরা-২, আয়াত-১৯: 'তারা বজ্রপাতের বিকট শব্দের দরুন তাদের আঙুল তাদের কানে ঢোকায়'। এর অর্থ কি তারা তাদের পুরো আঙুল তাদের পুরো কানের মধ্যে প্রবেশ করায়? বরং অর্থ হল, তারা তাদের আঙুলের অংশবিশেষ তাদের কানের একাংশে ঢোকায়। সুতরাং কুরআন মাজিদে সবজায়গায় একই অর্থ প্রয়োগ করা অনুচিত। এখন

আমাদের ভাবতে হবে, আলোচ্য বক্তব্যে কী উদ্দেশ্য? আয়াতে বলা হয়নি, আমি সমগ্র পৃথিবীটাকে সমতল বানিয়েছি। কিংবা আমি পৃথিবীর অমুক অংশটাকে বানিয়েছি সমতল। বরং বলা হয়েছে, তুমি কি দেখ না পৃথিবী কেমন সমতল করা হয়েছে? অর্থাৎ, তুমি পৃথিবীর যেখানেই যাও, দেখবে পৃথিবী সমতল। এতে প্রতীয়মান হয়, পৃথিবী সমতল নয়।

'এতে প্রতীয়মান হয়, পৃথিবী সমতল নয়' কথাটি শুনে সবাই হা করে তাকিয়ে রইল রিচার্ডের দিকে।

পৃথিবীর যেখানেই যাব সেখানেই দেখব পৃথিবী সমতল। এতে সহজেই আমরা এসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, পৃথিবী সমান নয়। কারন, পৃথিবী যদি সমান হত, তার শেষপ্রান্তও থাকত অবশ্যই। তা হলে–সন্দেহ নেই–তোমাকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো যে, তুমি পৃথিবীর শেষপ্রান্তে পৌঁছালে আর দেখলে পৃথিবী নেই! কিন্তু পবিত্র কুরআন বলছে, তুমি যেখানেই যাও পৃথিবীকে দেখতে পাবে–দেখতে পাবে সমান। আর এটা তখনি সম্ভব, যখন পৃথিবী হবে গোলাকার। তুমি পৃথিবীতে বিচরণ কর। সারাজীবন বিচরণ কর। যদি পার সৃষ্টিকর্তা থেকে হাজার হাজার বছর ধার নিয়ে বিচরণ কর। যেখানেই যাবে পৃথিবীকে দেখতে পাবে–দেখতে পাবে পৃথিবী সমান। এটা কী তোমাকে বোঝায় না যে, পৃথিবী গোলাকার?

রিচার্ডের কথা শুনে অবাক হল সবাই । তারা বলাবলি করতে লাগল, একি, যে আয়াত দিয়ে আমরা প্রমাণ করতাম পৃথিবী সমান। সেই আয়াত দিয়েই সে প্রমাণ করে ছাড়ল, পৃথিবী গোলাকার!

সবাই নিজ নিজ গন্তব্যে চলে গেল। রিচার্ড নাসরের কামরায় এসে দেখে নাসর ইয়ারফোন কানে দিয়ে কী যেন শুনছে। কী শুনছ দোস্ত, আমাকেও শুনতে দাও না? কিছুক্ষণ শোনার পর ইউশার বিস্ময়ের অবধি রইল না। সে দেখে তারই আলোচনাটা রেকর্ডকরা।

তুমি আমার কথা রেকর্ড করলে কীভাবে এবং কেনই বা করলে?

তুমি ইরফানের মোবাইল বেজে উঠতে দেখেছ কিনা?

হ্যাঁ। দেখেছি।

কল আমিই করেছিলাম। তাকে মোবাইল অন রাখতে বলেছিলাম। এমনটা করতে ইউশা ভাই বলেছিল আমাকে। মাশাআল্লাহ, তুমি দেখি বাঘের বাচ্চা। কিন্তু বল তো, এসব কথা কোত্থেকে শিখলে?

ইউশা ভাইই আমাকে শিখিয়েছে। বলেছে, ‘তুমি যেহেতু তোমার ক্লাসমেটদের কাছে এখনও নাস্তিক। তাই তারা তোমার কথা ফেলে দিতে পারবে না। তুমি তাদের সঙ্গে আপাতত ‘পৃথিবী গোলাকার না সমতল’ বিষয়টি আলোচনা করে তাদের ভুল ভাঙবার চেষ্টা করবে।’

রাতে রিচার্ড গেল ইউশার কাছে। বলল, ‘পুরুষ নয় নারীর মত’;কুরআনের এই বক্তব্য এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন বাণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারী পুরুষে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু নারীবাদীরা বলে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীপুরুষে কোন পার্থক্য নেয়। তো এবিষয়ে আমি আমার ক্লাসমেটদের কী বলতে পারি?

ইউশা বলল,

নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু গত শতাব্দীর ষাটের দশকে উত্থিত যৌন বিপ্লব এসব বাস্তবতা অস্বীকার করে বসেছে। তাদের এ উদ্ভট মতবাদের পথে কোন কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি একমাত্র বিজ্ঞান ছাড়া। তারা এ কথা ছড়িয়ে দিয়েছে যে, নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা তাদের এমতবাদকে প্রমাদাকীর্ণ করেছে।

লৌন ব্রিজেনদাইন (Louann Brizendine)। বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী। জন্ম গ্রহণ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫২ সালে। রচনা করেন ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ The Female Brain। নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টে সর্বাধিক বিক্রিত গ্রন্থের তালিকায় ছিল এটি। গ্রন্থটির চার নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন, scientists have documented brain differences bettween women and men. অর্থাৎ,বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, নারী পুরুষের মস্তিষ্কে পার্থক্য রয়েছে।

Brain sex: the real difference between men and women একটি আন্তর্জাতিকভাবে সর্বাধিক বিক্রিত গ্রন্থ। লেখেন এন মোয়ির (Anne Moir) এবং ডেভিড জেসেল (Devid Jessel) ।তারা গ্রন্থটির প্রথম পৃষ্ঠায় ভূমিকায় লেখেন,

There were scientifically and clinically demonstrable differences between the brains of men and women।

অর্থাৎ, নারী পুরুষের মস্তিষ্কে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রতিপাদনযোগ্য পার্থক্য রয়েছে।

৯ নং পৃষ্ঠায় লেখেন, 'প্রকৃত সত্য হল, প্রত্যেক পেশাজীবী বিজ্ঞানী ও গবেষকরা এসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নারী পুরুষের মস্তিষ্ক ভিন্ন।'

১৭৭ নং পৃষ্ঠায় লেখেন, 'আমরা একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাই–নারী পুরুষ উভয়ের সাথে সমান আচরণ করা উচিৎ। যে বিশ্বাস করবে নারী পুরুষ সমান, অথচ তারা সমান নয়। তা হলে আমরা বলব, তার মানসিক আলস্য ছাড়া এমন বিশ্বাসের পেছনে অন্যকোন কারণ থাকতে পারে না।'

এন মোয়ির এবং তার স্বামী বিল মোয়ির বিজ্ঞানীদ্বয় why men Don't Iron: The Fascinating and unalterable Defferences Between men and women শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তারা নারী পুরুষের আসল পার্থক্যসমূহ তুলে ধরেন। গ্রন্থটি এবিষয়ের একটি প্রামাণ্য গবেষণাকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

অন্যতম একজন লেখিকা হলেন, Carry L. Lukas। তিনি The politically incorrect guide to women, sex and feminism শীর্ষক গ্রন্থের পাঁচ নং পৃষ্ঠায় লিখেন, 'গবেষণায় দেখা গেছে, নারী পুরুষের মস্তিষ্ক ভিন্ন ভিন্নভাবে গঠিত। যা নারী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন কিছু চরিত্রের মূল কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে।'

সমুদ্র গর্ভে ঢেউ

ঢেউ পানির কোথায় থাকে, উপরে, নীচে, মধ্যে? এটা কোন প্রশ্ন হল? গভীর সাগর-মহাসাগরে ঢেউ কোথায় থাকে? আবার জিজ্ঞায়, উপরে। হ্যাঁ, কয়েকদিন আগ পর্যন্ত মানুষ এমনটাই জানত। গভীর মহাসাগরের ওপরে যেমন ঢেউ আছে, ঢেউ আছে তেমনি তার অভ্যন্তরে, মানুষ আগে জানত না। তাই 'অথবা তাদের দৃষ্টান্ত গভীর সাগরের মধ্যের অন্ধকারের মত, যাকে ঢেকে নেয় তরঙ্গ, তার ওপর রয়েছে তরঙ্গ,তার ওপর রয়েছে মেঘ, অন্ধকারের ওপর অন্ধকার... কুরআনের এই বক্তব্য অনেকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হত। অনেকের কাছে মনে হত প্রশ্নবিদ্ধ, কী বলে, গভীর সমুদ্রে নাকি আছে ঢেউয়ের নিচে আরও ঢেউ!

গ্রীন লাইন লঞ্চে বসা এক যুবক। বসা প্রথম সারির আসনে। সামনে আছে বিশাল বড় টিভি মনিটর। স্কেনে একের পর এক হৃদয়কাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আসছে আর কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর সুর শোনা যাচ্ছে। বেশ মুগ্ধকর পরিবেশ। হৃদয়কোণে লঞ্চকর্তৃপক্ষের প্রতি জন্ম নিলো শ্রদ্ধা ভালোবাসা। কিন্তু ক্ষণিকপর তাদের প্রতি তার এ শ্রদ্ধা-ভালোবাসা রুপ নেয় রাগ ও ক্ষোভে। লঞ্চ বন্দর থেকে ছাড়ার পরমুহূর্তেই শুরু হল ভারতীয় ছবির কানফাটা আওয়াজ। যানবাহনে এই একটা বিড়ম্বনা। লঞ্চছাড়ার আগে ঘোষণা করা হয়েছিল, যাত্রাপথে আল্লাহকে স্মরণ করুন। কিন্তু এরকম গানবাদ্য আর চলচ্চিত্র চালু থাকলে যাত্রীরা যাত্রাপথে আল্লাহকে স্মরণ করবে কীভাবে?

যুবকের পাশেই বসা অবসরপ্রাপ্ত এক সেনাকর্মকর্তা। মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি। ছবি দেখছেন না ঠিক, কিন্তু অসন্তোষের ছাপও দেখা যাচ্ছে না চেহারায়।

তার পাশেই আছেন এক সম্ভ্রান্ত দম্পত্তি। হঠাৎ, তাদের মাঝে কথা উঠল, গোগলের প্রতিষ্ঠাতা কে? একজন বলল, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনীলোক যিনি তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু ধনীলোকটির নাম মনে করতে পারছে না কেউ। হঠাৎ করে ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বিলগেটস। আশপাশের সবাই তখন তাকে ধন্যবাদ দিতে শুরু করল। যুবক বলল, গোগলের প্রতিষ্ঠাতা কে, গোগলে সার্চ দিয়েই তো জানতে পারেন? বিলগেটস গোগলের প্রতিষ্ঠাতা হতে যাবেন কেন? কেউ কেউ প্রথমে প্রতিবাদ জানালেও গোগল দেখে অবশেষে তাদের ভুল ভাঙল।

লঞ্চ এগিয়ে চলছে। পরিবেশ শান্ত। কিন্তু ধীরে ধীরে আকাশে কালো মেঘ দেখা দিচ্ছে। নদীর বুক ছাপিয়ে নামছে অন্ধকার। বাতাস বইছে হু হু করে। নিস্তরঙ্গ নদী হঠাৎ করে সাগরের দানবীয় ঢেউয়ে গর্জন করতে শুরু করল।

'না। না। অসম্ভব। যত্তোসব মূর্খতা। বিজ্ঞানের যুগে এমন অহেতুক কথা।' পাঠক ধারণা করতে পারছেন এসব কাদের কথা? এবং কেনই বা বললেন তারা? সে যুবক এবং তার আশপাশের যাত্রীদের মাঝে গোলমাল বেঁধেছে

নিশ্চই। হ্যাঁ, সঠিক ধারণা। নদীর দানবীয় ঢেউ দেখে যুবক বলে উঠল, আংকেল, জানেন সাগর-মহাসাগরের গভীরতায় এর চেয়ে বড় বড় ঢেউ রয়েছে?

কী বলছিলে আবার বল তো?

বলছিলাম, সাগর-মহাসাগরের ওপরে যেমন উথালপাথাল ঢেউ থাকে, তেমনি সাগর-মহাসাগরের গভীরেও রয়েছে ইয়া বড় বড় প্রবহমান ঢেউ।

ব্যাস, যুবকটি কথাগুলো বলামাত্রই উপরিউক্ত বাণীগুলো তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানাল। যুবককে একটু মন খারাপ করতে দেখা গেল। কেনই বা মন খারাপ করবে না? কারো কথা প্রত্যাখ্যান করার পন্থা কি এটাই?

আপনি গোগলে যান। দা টেলিগ্রাফ পত্রিকার ওবেসাইট খুলুন। এবার সার্চ ওপশনে গিয়ে Deep ocean waves discovered by scientists শিরোনামটি লিখে সার্চ দিন।

এশিরোনামটা কি পত্রিকারই না তুমি নিজে থেকে একটা বানিয়ে সার্চ দিতে বলছ?

আগে সার্চ তো দিন। পরে দেখা যাবে, শিরোনামটি আমার না পত্রিকার?

তারা সার্চ দিল। এ শিরোনামে একটা প্রবন্ধ দেখা গেল। প্রবন্ধটি ওপেন করে তারা দেখল বড় বড় অক্ষরে একটি প্রবন্ধের শিরোনামে লেখা, Deep ocean waves discovered by scientists।

শিরোনামটি দেখে ভদ্রমহিলা বললেন, দেখি ভেতরে কী লেখা আছে? খুব বিস্ময়ের ব্যাপার তো।

তিনি পড়তে লাগলেন,

British scientists have discovered waves that flow deep in the Pacific Ocean. Using ocean-going robots they detected the waves flowing eastwards almost a mile deep.

Scientists identify origins of freak waves

বৃটিশ বিজ্ঞানীরা প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে প্রবাহিত তরঙ্গমালা আবিষ্কার করেছে। তারা মহাসাগরগামী রোবট ব্যবহার করে চিহ্নিত করেছে যে, প্রায় এক মাইল গভীরে ঢেউসমূহ পূর্বমুখী প্রবাহিত হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা অদ্ভুত তরঙ্গসমূহের উৎপত্তি সনাক্ত করছে।

ভদ্রমহিলা সামনে পড়ে যাচ্ছেন, যার অর্থ হল,

'তরঙ্গসমূহ–ক্যালভিন তরঙ্গমালা নামে যা পরিচিত–সমুদ্র সৈকতে দেখা যাওয়া তরঙ্গসমূহ থেকে অনেক বেশি প্রশস্ত, দীর্ঘ, এবং ধীর গতির। তরঙ্গসমূহ সমুদ্র পৃষ্ঠে বা এর কাছাকাছি স্থানে থাকে, এটাই জানা বিষয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা গভীর সমুদ্রে তরঙ্গমালা দেখে বিস্মিত হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি অভ ইস্ট এঙ্গেলিয়া (ইউইএ)–র সমুদ্রবিজ্ঞানী প্রফেসর হেইউড এবং গবেষণার সহ-লেখক বলেন, 'আমরা উভয়েই বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্তছবির ইঙ্গিত অনুযায়ী আমরা ৫০ মিটার গভীরে কিছু পাবার আশা করছিলাম। কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষেই উত্তেজিত হয়েছি, যখন ১৫০০ মিটার গভীরে এসব তরঙ্গ দেখতে পেয়েছি। এটা এ সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয় যে, আরও অনেক গভীরেও রয়েছে তরঙ্গমালা ।'

আবহাওয়াবিজ্ঞানী ও বিখ্যাত লেখক ড. অ্যাড্রিয়ান ম্যাথিউস বলেন, 'প্রত্যেকেই ধারণা করেছে যে, ২০০ মিটার নিচে কোন তরঙ্গ পাওয়া সম্ভব নয়।'

প্রবন্ধটি পড়ার পর সেই প্রতিবাদী মহান সেনাকর্মকর্তা লজ্জায় মাথা নীচু করে বসে রইলেন। তাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই যুবক বলে উঠল, সমুদ্রের গভীরতায় তরঙ্গ রয়েছে একথা কিন্তু কুরআনেও আছে।

তারা বিশ্বাস করতে পারছে না, এ কথা কুরআনে থাকবে কীভাবে? তারা বলল, একথা কুরআনে থাকবে কেন? আমরা দেখলাম এতথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েক বছর আগে মাত্র।

এবার যুবক তাদেরকে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ও তার অনুবাদ দেখাল—

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

অর্থাৎ, ‘অথবা তাদের কার্যাবলির দৃষ্টান্ত এরকম, যেন গভীর সমুদ্রে বিস্তৃত অন্ধকার, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গ, যার ওপর আরেক তরঙ্গ এবং তার উপরে মেঘরাশি। এভাবে স্তরের ওপর স্তরে বিন্যস্ত আধারপুঞ্জ। কেউ যখন নিজ হাত বের করে, তাও দেখতে পায় না। বস্তুত: আল্লাহ যাকে আলো দেন না, তার নসিবে কোন আলো নেই।’[৩১]

কুরআন মাজিদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সমুদ্রে দুই স্তরের ঢেউ রয়েছে। এক স্তরের ঢেউ সমুদ্রের উপরে। আরেক স্তরের ঢেউ সমুদ্রের গভীরে।

এক যুবক কোথায় থেকে যেন এসে তাদের কথোপকথন শুনছিল। আলোচনা শেষ না হতেই সে বলে উঠল, ভাই, সমুদ্রের গভীরে তরঙ্গস্তর রয়েছে এটা বিজ্ঞানের আবিষ্কার। একথা কুরআনে নেই। কুরআনের ওপর বিজ্ঞান চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

যুবক আপত্তিকারীর প্রতি তাকিয়ে তাকে চিনে ফেলল। নাম শাকিল। দেশের একটি নামিদামি কোম্পানির উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। অনলাইনে কুরআনের বিরুদ্ধে লেখালেখি করা তার জীবনসংগ্রাম। যুবক তৎক্ষণাৎ তার ব্যাগ থেকে একটি লেখা বের করে শাকিলের সামনে তুলে ধরল। লেখাটি দেখে শাকিলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার তখন, ‘ছাইরা দে মা কাইন্দা বাঁচি’ অবস্থা।

ঘটনা হল, এই শাকিল একটা সময় আলোচ্য আয়াতটিকেই বিজ্ঞান বিরোধী হিসেবে পাঠকের সামনে তুলে ধরত। বলত,

‘দেখুন, কুরআন বলছে, গভীর সমুদ্রে রয়েছে অন্ধকার আর অন্ধকার। আর সেই গভীর সমুদ্রকে আচ্ছন্ন করে রাখছে ঢেউ।

[৩১] সূরা নূর-৪০।

গভীর সমুদ্রকে যেহেতু ঢেউ আচ্ছন্ন করছে, এর দ্বারা অবশ্যই বুঝে আসে গভীর সমুদ্রে ঢেউ রয়েছে। কারণ গভীর সমুদ্রে যদি ঢেউ না থাকে তা হলে সেই গভীর সমুদ্রকে ঢেউ আচ্ছন্ন করে রাখার প্রশ্নই আসে না।

দেখুন কুরআনের অপব্যাখ্যা করবেন না, এখানে যদি ওপরের ঢেউই বোঝানো উদ্দেশ্য হত, তা হলে গভীর সমুদ্রের কথা বলার কোন দরকার ছিল না। শুধু সমুদ্র বা নদী বললেই চলত, কারণ প্রচণ্ড ঝড়ের সময় মেঘনার মত নদীতেও ইয়া বড় বড় ঢেউ দেখা যায়।

আরও লক্ষ করুন, আয়াতটিতে বলা হয়েছে, তরঙ্গ, তার ওপর রয়েছে তরঙ্গ। এখানে স্পষ্টতই স্বয়ংসম্পূর্ন দু'টি তরঙ্গ স্তরের কথা বলা হয়েছে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন গভীর সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গ আছে বলে মেনে নেবেন।

আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, সমুদ্রপৃষ্ঠে এক ঢেউ আরে ঢেউয়ের ওপরে থাকে না। সুতরাং তা উদ্দেশ্য হবে না। আমি আশা করি, আপনাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, কুরআন বলছে, সমুদ্রের গভীরে ঢেউ রয়েছে।

আর নিঃসন্দেহে এটা বিজ্ঞান বিরোধী কথা। বিজ্ঞানীরা কখনও বলেননি, গভীর সমুদ্রে ঢেউ রয়েছে। বরং তারা বলেছে, সেখানে একধরণের বিদ্যুত তরঙ্গ রয়েছে। তারা কখনও প্রকৃত তরঙ্গের কথা বলেননি। আর কুরআন বিজ্ঞান বিরোধী হওয়াটাই প্রমাণ করে, কুরআন সৃষ্টার বাণী হতে পারে না।

স্রষ্টা থাকলেই তো স্রষ্টার বাণী হবে!'

এই হচ্ছে শাকিলের বক্তব্য।

যুবক শাকিলকে প্রশ্ন করল, যেই আপনি একসময় বলতেন এ কথা, সেই আপনিই কীভাবে বললেন, গভীর সমুদ্রে ঢেউ রয়েছে, এটা কুরআনে নেই? কুরআনের ওপর এ কথা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে?

শাকিল উত্তর না দিয়ে চলে গেল।

যুবক ফোন করল শাকিলের ক্লাইন্ড মুন্নার কাছে। ঘটনা খুলে বলল, এবং জিজ্ঞেস করল, কিন্তু শাকিল এখন এর বিপরীতটা বলছে কেন?

মুন্না জানাল, 'কয়েকদিন আগে শাকিল ইউশা নামে এক বিজ্ঞানগবেষকের লেখা পড়ে জেনেছে, বিজ্ঞানীরা অধুনা নিশ্চিত হতে পেরেছেন, গভীর সমুদ্রে

সমুদ্রপৃষ্ঠের তরঙ্গের মতই রয়েছে প্রকৃত তরঙ্গ। তখন থেকেই সে তার বক্তব্য পাল্টে দিয়েছে এবং তার ওয়েবসাইট থেকে লেখাটিও ডিলিট করে দিয়েছে। এখন বলা শুরু করছে, গভীর সমুদ্রে ঢেউ রয়েছে এটা বিজ্ঞানের আবিষ্কার। কুরআনে এ তথ্য আছে বলে যারা প্রচার করে, তারা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে।'

যুবকটি মুন্নার কথা শুনে বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল? মানুষ এতটা স্বার্থান্ধ হতে পারে, সে ভাবতেও পারেনি।

লঞ্চ বন্দরের কাছাকাছি চলে এসেছে। যুবকের আশপাশের যাত্রীরা তার কাছে জানতে চাইল তার পরিচয়। আমি পবিত্র কুরআনের একজন নগণ্য খাদিম এটাই আমার পরিচয় বলে তাদের আড়াল হয়ে যায়। তারা লঞ্চের আনসারদের জিজ্ঞেস করলে তাদের একজন বলল, আমি তাকে অনেক আগ থেকেই চিনি। সে ইউশা।

আঁধারে ঢাকা সূর্য

সূর্য আলোকময়, কিন্তু তার চারপাশ আঁধারে ঢাকা, সূর্যের এমন চিত্র কি কখন দেখেছেন? সর্বোচ্চ বলতে পারেন, হ্যাঁ, দেখেছি সূর্যগ্রহনের সময়। কিন্তু সূর্যের চারপাশ আঁধারে ঢাকা এটা সার্বক্ষণিক চিত্র।

কি, অবাক হলেন?

সূর্য পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারত না, যদি আরেকটি জিনিস সঙ্গ না দিত সূর্যের আলোর।

কী সেই জিনিস?

পবিত্র কুরআনের রচয়িতা জানতেন না, কেন হয় রাত, কেন হয় দিন? না এর চেয়েও বিস্ময়কর কিছু আছে তাতে?

ঠক ঠক ঠক। দরোজায় করাঘাতের শব্দ। এই রাত দুপুরে কারও আসার কথা নয়। কোন দুর্ঘটনার আভাস তো নয়, কে জানে। গতকালই তো পাশের ভবনে দিনদুপুরে ডাকাতি। ভয় পেলেও যুবক সাহস করে দরজা খোলল।

একি তোমরা, তাও আবার এত রাতে?

এই তো বন্ধুবান্ধব মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম। ফেরার পথে মনে হল, তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করে যাই।

মুসকান, রাত অনেক হয়ে গেছে। বেশি দেরি করা ঠিক হবে না। যা বলার তাড়াতাড়ি বল। বলল আগন্তুকদের একজন।

মুসকান তাদের প্রধান, জ্ঞানে ও দেহঅবয়বে।

আজ বিকেলে কুরআন খুলতেই সামনে পড়ল একটি আয়াত। সুরাটির নাম যেন কি? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সুরা শামস। সুরাটির নামই হল, সূর্য। বোঝাই যাচ্ছে, সুরাটিতে সূর্যের ব্যাপারে আলোচনা করা হবে। আমি এতে আশ্চর্যবোধ করিনি। কারণ সেই আদি যুগের মুহাম্মাদ সূর্য সম্পর্কে কীই-বা বলবে? আমার ধারণা ঠিক হল। সুরাটিতে দুইটি আয়াত পরেই রয়েছে এমন কথা, যা অলৌকিক হওয়া তো দূরে থাক, বিজ্ঞান ও বাস্তবতার নিরীখে সম্পূর্ণ ভুল।

সেখানে আছে, 'দিন সূর্যকে আলোকিত করে। আর রাত সূর্যকে ঢেকে নেয়।' আশ্চর্য, দিন সূর্যকে আলিকত করা, রাত সূর্যকে ঢেকে নেয়া, এসবের মানে কী? সূর্যের কারণেই তো রাত দিন হয়। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, কুরআন রচয়িতা জানত না, রাত দিন কেন হয়। সুতরাং দোস, তুমি আমাদের কথা শোন। আদিকালের এসব পুঁথিপত্র বাদ দাও। বিজ্ঞানের আলোয় বরং নিজের মেধাকে আলোকিত কর।

গড় গড় করে কথাগুলো বলে ফেলল মুসকান। মনে হল, সে প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে।

তার কথা শুনে যুবক অস্থির। যদিও সে মুসলিম পরিবারের সন্তান এবং সে ইউনিভার্সিটিরও ছাত্র, কিন্তু কার্যত কুরআনের সাথে সম্পর্ক না থাকার দরুন কথাগুলো তার হৃদয়ের গভীরে তীরের মত বিঁধল। সে প্রতিবাদ জানাল, না। কুরআনে কোন ভুল থাকতে পারে না। কুরআন আল্লাহর কিতাব। আল্লাহ কখনও ভুল করতে পারেন না।

মুসকান বলল, তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ? দেখনি। আসলে আল্লাহ বলতে কিছু নেই। আল্লাহ, জান্নাত, জাহান্নাম, এসব ধার্মিকদের বানানো। ওরা এসব দিয়ে পৃথিবীকে অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে।

যুবক বলতে গিয়ে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, ইস! তাকে যদি এখন কাছে পেতাম। সে এদের মুখে চুনকালি মেখে দিত।

হঠাৎ করে সবাই শুনল একটি ধ্বনি–আস সালামু আলাইকুম। যুবকটি দ্বিতীয় বারের মত চমকিত হল।

আরে, আমি তো মনে মনে তোমাকেই স্মরণ করছিলাম। এমুহূর্তে তোমাকে এখানে পেয়ে আমি আমি কী যে বলবো, সত্যিই বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি।

আগন্তুক যুবক চকিৎ দৃষ্টিতে উপস্থিত সবাইকে দেখে নিল। যেন সে এদের আগ থেকেই জানে এবং এদের কিছু বলতে চাইছে।

দেখ। আল্লাহর কী মহিমা! –যুবকটি বলতে শুরু করল–যখন কেউ নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থণা করে, আল্লাহ তার সামনে পথ খোলে দেন। কতদিন ধরে কুরআন মাজিদের একটি আয়াতের অর্থ বোঝার চেষ্টা করে আসছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারিনি। সুরা শামসে শুরুর দিকে আল্লাহ তায়ালা সূর্য-চাঁদের, দিন-রাতের আলোচনা করেছেন। বলেছেন, দিন সূর্য উদ্ভাসিত করে এবং রাত সূর্যকে ঢেকে নেয়। আমি বুঝতে পারিছলাম না–দিন সূর্যকে উদ্ভাসিত করার মানে কী? কারণ সূর্যের কারণেই তো হয় দিন, হয় রাত? আমি আশায় ছিলাম আল্লাহ আমাকে এর অর্থ উদ্ঘাটন করার তওফিক দেবেন। অবশ্যই দেবেন। আমি জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইপুস্তক পড়ার গতি ও পরিমাণ বাড়িয়ে দিলাম। নাসাসহ আন্তজার্তিকভাবে সমাদৃত বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বিচরণ করতে লাগলাম। আল্লাহর শোকর বন্ধু, আল্লাহর শোকর, আমি এর অর্থ বুঝেছি। এবং কত

খুশীই না হয়েছি আমি! কুরআন মাজিদের মহিমায় আমি আরও স্নাত হলাম। কী আশ্চর্য, এমন বিস্ময়কর ও অদ্ভুত কথা কুরআন মাজিদে উল্লেখ করা হয়েছে!

আবেগের আতিশয্যে বক্তার চক্ষু অশ্রুসিক্ত। উপস্থিত আগন্তুকেরাও তার কথায় কিছুটা প্রভাবিত হল।

যুবক বক্তাকে থামিয় বলল, দোস্ত, আমরা তো এবিষয়েই আলোচনা করছিলাম। তুমিও এপ্রসঙ্গে আলোচনা টানলে কীভাবে?

বক্তা নীরব।

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তারা বলাবলি করতে লাগল, সে কী জেনেছে, কিছুই তো বলছে না। শুধু কুরআনের মহিমাই গেয়ে যাচ্ছে।

বক্তা ওদের মনোভাব ও ফিসফিসানি অনুধাবন করতে পারল।

তোমাদের কেউ কি ভারতের জয়ন্ত নারলিকার (jayant v. narlikar) বিজ্ঞানীকে চেন? তিনি ক্যমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। একজন সমাদৃত জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

ওরা চুপ। একজন বলে উঠল, মনে হয় আপনি ভুল নাম বলছেন, আমরা এমন নাম কখনও শুনিনি।

বক্তা রাগ করল না। বিরক্ত হল না। সাথে থাকা থলে থেকে একটি বই বের করল। বের করল একটি লেপটপও।

বক্তা মুসকানকে বলল, তোমার হাতেই তো আছে আইফোন। জয়ন্ত নারলিকার লিখে উইকিপিডিয়ায় সার্চ দাও।

তারা দেখল। লজ্জা পেল।

বক্তা কথা চালিয়ে যেতে লাগল, এই বিজ্ঞানীর একটি সুন্দর বই আছে। এই দেখ। আমার হাতের বইটি দেখ। সবাই দেখল, বইটির নাম seven wonders of the cosmos ।

জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার এই গ্রন্থে ‘দ্বীপ্রহরে অন্ধকার’ শিরোনামের আলোচনায় সূর্যের একটি ছবি তুলে ধরেন। যাতে দেখা যাচ্ছে, সূর্য প্রজ্বলিত ঠিক, কিন্তু

সূর্যের চারপাশ ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা। তিনি সেই ছবিটি সামনে রেখে পাঠককে লক্ষ করে বলেন,

‘আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল সূর্য। হ্যাঁ, আলোকিত গোলাকার বস্তুটি আসলেই সূর্য, কিন্তু নীল রঙে সারা আকাশা ছেয়ে ফেলা সূর্যের চিরাচরিত আলো কিসে ঢেকে ফেলল? সূর্য কি তার আশপাশ আলোকিত করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে?

সূর্যের চারপাশ আঁধারে ছেয়ে যাওয়ার একটাই অবস্থা যা খুব কম ঘটে থাকে, তা হল, পূর্ণ সূর্যগ্রহণ (total solar eclips)। পূর্ণ সূর্য গ্রহণ হলে তো চাঁদের কারণে সূর্য দেখাই যাবে না, কিন্তু এখানে সূর্য দেখা যাচ্ছে ঠিক, তবে তার চারপাশ ঘুটঘুটে আঁধারে ঢাকা! তা হলে এ ছবিটি সত্য বলে ধরে নেয়া যায় কীভাবে?

প্রশ্নটির উত্তর দেয়ার আগে এবং তোমার কাছে ছবিটির রহস্য উন্মোচন করার আগে চল আমরা সেই কারণ উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত হই, যার ফলে ভোরের রাঙা সূর্য যখন উদিত হয় তখন আকাশ কেন নীল দেখায়? আবার একই আকাশ কেন সূর্যাস্তের সময় দেখায় দিগন্ত জুড়ে লাল রঙের ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত? বরং সূর্যটাই কেন তখন লাল রঙে রক্তিম দেখায়? কেন হয় এমনটা?

আকাশ কেন নীলিমা ছড়ায়?

এর উত্তর হল, যখন সূর্যরশ্মি ক্ষুদ্রাকার ধূলিকণার ওপর পতিত হয়, তখন সেই আলো দুই অবস্থার এক অবস্থার সম্মুখীন হয়। হয়ত সেই ধূলিকণা আলোকরশ্মি চুষে ফেলবে, কিংবা সেই আলোক রশ্মির গতিপথে পরিবর্তন ঘটবে। যেমন একটি প্রস্তরখণ্ড থেকে যখন ভূমিতে কোন বল পড়ে, তখন তার গতিপথে পরিবর্তন ঘটে। তেমনিভাবে সূর্যরশ্মি যখন ধূলিময় ক্ষেত্র অতিক্রম করে, তখন তার কিছু চুষিত হয়ে যায় আর বাদবাকি একটার পর একটা ধূলিকণার সম্মুখীন হওয়াতে ছড়িয়ে পরে।

এখন তুমি চিন্তা কর ভিন্ন একটি অবস্থা–যেখানে সূর্যের আলো কোন ধূলিকণারই সম্মুখীন হয় না। তখন এই আলো কিছুতেই ছড়াবে না। আর সেসময় আমরা কেবল আলোকিত সূর্যগোলকটাই দেখতে পাব। এছাড়া অন্য

কিছুই আলোকিত দেখাবে না। কারণ এ অবস্থায়, এমন কিছু নেই, যার ওপর সূর্যের আলো পড়তে পারে আর তা সূর্যের আলো ছড়িয়ে দিতে পারে।

আমরা ধূলিময় বায়ুস্তর দ্বারা বেষ্টিত। সূর্যের আলো তাতে পড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিধায় আমরা আলোকিত ও উদ্ভাসিত আকাশ দেখতে পায়।

তুমি জিজ্ঞেস করতে পার, পৃথিবীর কারো পক্ষে এটা জানা কেমন করে সম্ভব?

উত্তর হল, তুমি ভূপৃষ্ঠে থেকে তা অনুধাবন করতে পারবে। এইজন্যে যে তা দেখতে চায়, তাকে পৃথিবী ছাড়তে হবে এবং পৃথিবীর বায়ুস্তর অতিক্রম করে উর্ধ্বে উঠতে হবে। তবেই সে আমরা যা বললাম, তা স্বচক্ষে দর্শন করতে সক্ষম হবে।’

বক্তা কথা শেষ করল। লক্ষ করল, সবার চোখেমুখে বিস্ময়।

প্লিজ, আমাদের আরও কিছু ফটো দেখান। কী অদ্ভুত ব্যাপার রে ভাই। বলল ওদের একজন।

আলোচক তাদেরকে নাসার ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা কিছু ছবি দেখাল।

পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সূর্য জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু তার আশপাশজুড়ে অন্ধকার আর অন্ধকার।

একি আসমান কোথায়? সারা পৃথিবী ঘিরে থাকা আলো কোথায়? বলতে লাগল কয়েকজন।

তোমরা দেখলে কীভাবে অন্ধকার সূর্যকে ঘিরে নেয়। পৃথিবীর যে অংশটি সূর্যমুখী থাকে তার বায়ুস্তরে সূর্যের আলো পড়ার দরুন জগত এতটা আলোকিত দেখায়। সূর্যকে দেখায় এতটা আলোকউদ্ভাসিত। তো তোমরা আমাকে বল, দিন সূর্যকে সমুদ্ভাসিত, সমুজ্জ্বল করছে কি না? কেউ বলল, হ্যা। কেউ বলল, আরেকটু ডিটেইল চাই আমরা।

সূর্যের আলো পৃথিবীতে পড়লে পৃথিবীতে দিন হয়। পৃথিবী আলোকিত হয়। মানুষ তো এটাই জানত। কিন্তু এই আলোই, এই দিনই সূর্যকে আলোকিত করে। উদ্ভাসিত করে। সূর্যের আলোয় আলোকময় করে সবদিগন্ত। এবাস্তবতাটা জানত না কেউ। আজ মানুষ পৃথিবীর ঊর্ধ্ব দেশে আরোহন

করেছে। সেখানে গিয়ে সে বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছে। তাই সে সবিস্ময়ে এর বিবরণ দিচ্ছে।

তা হলে সেই চৌদ্দশ' বছর আগে মরুর দেশের নিরক্ষর লোকটি কীভাবে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলল এই বাস্তবতাটি? কারো চোখ যদি খোলা থাকে, হৃদয় যদি উন্মুখ থাকে, তা হলে সে কুরআন কারিমের অলৌকিকতার, সততা ও যথার্থতার নতুন দিগন্তের দেখা অবশ্যই পাবে।

কুরআন কারিমে যদি থাকত, 'শপথ সূর্যের যা পৃথিবী আলোকিত করে', তা হলে স্থূল দৃষ্টির লোকেরা এতে কোন অসঙ্গতি লক্ষ করত না। কিন্তু এতে তখন অভিনবত্বের কিছু থাকত না। তদুপরি কথাটা হত অসম্পূর্ণ। কারণ শুধু সূর্যের আলো পড়লেই 'আলো–দিন' হয় না। পৃথিবীর বায়ুস্তরের ওপরে 'আলো–দিন' নেই অথচ সূর্য দেখা যাচ্ছে। সূর্য জ্বলছে। সুতরাং একমাত্র সূর্যের কারণেই দিন হয় কথাটা অসম্পূর্ণ। বরং সূর্য এবং সূর্যের আলো বিচ্ছুরণকারী পৃথিবীর বায়ুস্তরের কারণেই পৃথিবীতে 'আলো' হয়।

তাই কুরআনে বলা হয়েছে, শপথ দিবসের, যা সূর্যকে 'মুজাল্লা' তথা সুপ্রকাশিত, সমুদ্ভাসিত, সমুজ্জ্বল করে। কেউ যদি দূরে বহুদূরে একটি আলো জ্বলতে দেখে কিন্তু তার আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত নয়। বরং তার চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তখন সেই আলোকে লক্ষ করে কেউ একরাশ বিস্ময় নিয়ে বলে না, ইস, কী উদ্ভাসিত আলো! যখন সূর্যগ্রহণ হয়, তখন মানুষ বিস্ময়ে বলে না, সূর্যের কী আলো! কেন বলে না? কারণ তখন সূর্য ততটা জ্বলন্ত দেখায় না। তদুপরি সূর্যের চারপাশ দেখায় আঁধারে ঢাকা।

তো কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা এই বিস্ময়কর বাস্তবতাই তুলে ধরে বলেছেন, 'শপথ দিবসের যা সূর্যকে সমুদ্ভাসিত করে। শপথ রাত ও আঁধারের যা সূর্যকে গ্রাস করে ফেলে/ ঢেকে ফেলে।'

রাত তো কোন প্রাণীর নাম নয়। রাত অন্ধাকারেরই নাম। মানুষ সব সময় শুনে আসছে, দেখে আসছে, সূর্য অন্ধকার দূরিভূত করে। কিন্তু অন্ধকার সূর্যকে গ্রাস করে নেয়, অন্ধকার সূর্যকে ঢেকে নেয়, এটা মানুষ কখনো জানত না। কুরআন মাজিদে কীভাবে তুলে ধরা হল, এমন বিস্ময়কর বাস্তবতা?

পাশের কামরায় কী যেন শব্দ হল। যবুকটি ওঠে যেতে চাইলে আলোচক বাধা দিয়ে বলে, তুমি থাক আমি যাই।

এর মধ্যে আগন্তুকরা জিজ্ঞেস করল, এই যে আমাদের সামনে এতক্ষণ ধরে কথা বলল, এই ছেলেটি কে?

এ হল, ইউশা।

আলোচকের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে যুবক তাকে দেখতে গেল।

কী মা কখন এলে?

এই তো দশ বারো মিনিট হল।

ইউশা, তুমি এজন্যেই বুঝি দেরি করছিলে? মা! তোমার এই বোনপুত আমাকে আজ কী ভয়ানক ঝড়ের কবল থেকেই না রক্ষা করেছে!

কোয়, কোন ঝড় হতে তো দেখিনি?

এই তো আসছি, সব খুলে বলছি তোমাকে।

ক্ষণিকপর ইউশা আর যুবকটি এসে দেখল মুসকান নেই। নেই আগন্তুক যুবকদের অনেকেই। বসে আছে শুধু দু'জন।

ওরা গেল কোথায়?

আলোচকের নাম ইউশা, শুনে ওরা চলে গেল। তাদের ভয় ছিল, ইউশা তাদের প্যাঁচে ফেলে দেয় যদি আবার!

যুবক ইউশাকে বলল, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি আজ এ আলোচনাটা করলে কেন? তারা তো হুবহু আমাকে এটা নিয়েই পাকড়াও করেছিলে? কোন দৈবশক্তি আছে নাকি তোমার!

দৈবশক্তি বলতে কিছুই নেই আমার। আসল ব্যাপার হল, আমি তোমার দরজায় এসে ওদের কথা শুনতে পাই। আমি অপেক্ষায় থাকি তারা শেষ পর্যন্ত কী বলে? তোমাকে চুপ করে থাকতে দেখে দেরি না করে তাড়াতাড়ি রুমে ঢুকলাম।

উপস্থিত শারাফাত আর আরাফাতকে লক্ষ করে ইউশা বলল, শোন বন্ধুরা। মহাজগৎ দাঁড়িয়ে আছে মহাকর্ষ শক্তির ওপর। এটা বিজ্ঞানীদের অবিসংবাদিত মত। আজ সাধারণ লোকজনও জেনে গেছে যে, গ্রহউপগ্রহ

ঘুরছে, শূন্যে ভাসছে এসবকিছু হচ্ছে মহাকর্ষ শক্তির বদৌলতে। বল তো আজ পর্যন্ত কেউ কি এই 'মহাকর্ষ শক্তি' পত্যক্ষ করেছে?

নো, হাউ কেন ইট বি পসিবল? বলে উঠল শারাফাত আর আরাফাত।

তোমরা বললে এপর্যন্ত কেউ কখনও মহাকর্ষ শক্তি প্রত্যক্ষ করেনি। তো 'না দেখা'র দরুন কেউ কি এই মহাকর্ষ শক্তি অস্বীকার করেছে? করেনি। আজ কেউ যদি বলে, না। মহাকর্ষ শক্তি বলতে কিচ্ছু নেই। এসব বিজ্ঞানী নামক ধোকাবাজদের বানানো কথা, যদি মহাকর্ষ শক্তি নামে কিছু থাকত তা হলে তা জীবনে একবার হলেও আমাদের 'দর্শন' দিত। এমন কথা যে বলবে সে কি 'হিরো' হয়ে উঠবে না মানুষ তাকে 'মানসিক প্রতিবন্ধী' বলবে? কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে এধরণের কথা বলে একদল লোক হয়ে উঠছে হিরো ও স্টার।

ব্রেইন না দেখেই সে ব্রেইনের অস্তিত্ব স্বীকার করে। হার্ট না দেখেই সে হার্টের অস্তিত্ব স্বীকার। তা হলে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকারের জন্যে আল্লাহকে দেখতে হবে কেন তার? আল্লাহর সৃষ্টি ও সৃষ্টিকুশলতাই কি তাকে জানান দেয় না তার অস্তিত্ব?

ভ্রূণ সৃষ্টিতত্ত্ব ও আধুনিক বিজ্ঞান

কুরআন বিদ্বেষীরা বিশেষত, নাস্তিকেরা পবিত্র কুরআনের ভ্রূণসৃষ্টি বক্তব্যে এত বিরোধ, অসামঞ্জস্য খোঁজে পায় যে, তারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী মানতে নারায। মূলত তারা সেসময় থেকে কুরআনকে আল্লাহর বাণী মানতে নারায, যেসময় থেকে ইসলামকে প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। ফলে পবিত্র কুরআনের সব বক্তব্যকেই তারা 'অবৈজ্ঞানিক প্রমাণিত করতে' সর্বদা সচেষ্ট। ভ্রূণ সৃষ্টিবিষয়ক তাদের প্রতিটি আপত্তি ও তার অসারতা আমরা তুলে ধরেছি। কুরআনের ওপর ওদের আপত্তি কতটা সত্যবিবর্জিত ও দুরভিসন্ধিমূলক হতে পারে, সহজেই অনুমান করতে পারব আমরা।

যে বস্তুটি যত সুস্পষ্ট, যত পরিষ্কার একশ্রেণির মানুষের কাছে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় তত ঘোলাটে, তত হেঁয়ালিপূর্ণ। কুরআন মাজিদের ভ্রূণ সৃষ্টি তথ্যের ব্যাপারেও ঘটেছে তেমনটা। ইসলাম বিদ্বেষীরা এতে এত অসঙ্গতি, গড়মিল খোঁজে পায় যে, তারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায়। কিন্তু আরেক শ্রেণির মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়–ভ্রূণসৃষ্টি তথ্যে বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা লক্ষ করে!

আপত্তি-০১: কুরআনের তথ্য গ্রীকদের থেকে সংগৃহীত!

তাদের একটা আপত্তি হল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের ভ্রূণ সৃষ্টি তথ্য গ্রীকদের থেকে গ্রহণ করেছেন। তাই দেখা যায়, কুরআনের ভ্রূণ সৃষ্টির সমূহধাপ গ্রীকদের বলা ধাপসমূহের সাথে মিলে যায়!

এটা প্রমাণ করে, কুরআনের ওপর আপত্তিকারীরা অসাধুতার নর্দমায় কতটা নিমজ্জিত। বাস্তব অবস্থা থেকে কতটা দূরে নিক্ষেপিত। কুরআনের স্তর আর গ্রীকদের স্তরে পার্থক্য আছে গোড়াতেই।

হিপোক্রেটিস বলেছে, ভ্রূণসৃষ্টির সূচনা হয় কেবল নারীর ঋতুস্রাবের রক্তের মাধ্যমে। এরিস্টটল তার বিরোধিতা করে বলে, নারীর ঋতুস্রাবের রক্ত তো আছেই, আছে পুরুষের বির্যও।

গ্যালন তাদের বিরোধিতা করে বলে, নারীর ঋতুস্রাবের রক্ত এবং নারীপুরুষ উভয়েরই সিমান তথা বির্য থেকে সৃষ্টি হয় ভ্রূণ।

দেখা গেল, হিপোক্রেটিস ভুল করেছে। তার ভুল সংক্রামিত হয়েছে এরিস্টটল, গ্যালনের দিকে। এই ভুলসহ আরও ভুল দাপিয়ে বেড়িয়েছে আঠার শতক অবধি। যখন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হল, কেবল তখনি মুক্ত হতে পেরেছে মানুষ সেসব ভুল থেকে। সহজেই অনুমেয়, ভ্রূণসৃষ্টির ধাপসমূহ সঠিকভাবে জানার একমাত্র মাধ্যম জরায়ু নিরীক্ষণ যন্ত্র। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তো কোনও যন্ত্র ছিল না, তা হলে সঠিক তথ্য জানলেন কীভাবে তিনি? স্পষ্টতই যিনি সৃষ্টি করেন ভ্রূণ তিনিই জানিয়েছেন তাকে ভ্রূণসৃষ্টির সঠিক ধাপ।

আপত্তি-০২: ভ্রূণসৃষ্টি ও জমাটবাঁধা রক্ত

কুরআন কারিমে আছে, ভ্রূণ সৃষ্টি হয় ‘আলাকা’ থেকে। ‘আলাকার’–র অর্থ, জমাটবাঁধা রক্ত। এটা ভুল। সৃষ্টির কোন পর্যায়ে ভ্রূণ জমাটবাঁধা রক্ত থাকে না।

এমনটা যাদের দাবি আমরা তাদের আহ্বান করি চিন্তাশক্তিকে আরও শানিত করতে এবং গবেষণা-অধ্যয়নের সীমা আরও বিস্তৃত করতে। যারা কুরআনের ওপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তি করে, একে তো ওরা আরবিভাষায় অভিজ্ঞ নয়। দ্বিতীয়ত ওরা বিজ্ঞানীও নয় এবং বিজ্ঞানে পারদর্শীও নয়।

علقة শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়:

১. জোঁক। ‘আলাকা’-র এ অর্থটি অধুনা সৃষ্ট নয়। বরং প্রাচীন আরবেও শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হত। প্রখ্যাত আরবিভাষাবিদ আবুল ফাতহ নাসিরুদ্দিন মুতাররিযি তার অভিধানগ্রন্থ আল মুগরিব ফি তারতিবিল মু’রিব–এর ২ নং খন্ডে ৮০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, আলাক এবং আলাকা-র অর্থ হল, জোঁক।
২. শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে عَلِقَ يَعْلَقُ (আলিকা-ইয়ালাকু) ক্রিয়া থেকে, যার অর্থ, লেগে থাকা। এঁটে থাকা।
৩. জমাটবাঁধা রক্ত।

ভ্রূণবিদ্যায় বিশ্বের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব ড. ক্ষিত মুড় বলেন, আলাকা–র উল্লিখিত প্রতিটি অর্থই বাস্তব। আধুনিক ভ্রূণবিদ্যার সঙ্গে সুপ্রযুক্ত।

১. ড. ক্ষিত মোড় একবার ডোবার দিকে তাকিয়ে জোঁক দেখতে পান এবং জোঁক ও ভ্রূণের মধ্যে অনেকটা মিল ও সদৃশ লক্ষ করেন। এরপর তিনি জোঁকের ছবি ও ভ্রূণের ছবি পাশাপাশি রেখে তুলনা করে বলেন, ভ্রূণ ‘আলাকা’-র স্তরে জোঁকের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্য রাখে।
২. ক্ষিত মোড় এটাও দেখিয়েছেন যে, আলাকা–র স্তরে ভ্রূণ তার মায়ের জরায়ুর সাথে লেগে থাকে।
৩. আরবিভাষায় আলাকা–র আরেকটি অর্থ হল, জমাটবাঁধা রক্ত। প্রফেসর ক্ষিত মুড় উল্লেখ করেন, আলাকা–র স্তরে রক্তনালিতে

আবদ্ধ থাকে ভ্রূণের রক্ত। ফলে ভ্রূণের আকৃতি জমাটবাঁধা রক্তের আকৃতির মত দেখায়।

তো প্রতিটি অর্থেই কুরআনের তথ্য বাস্তবানুগ।

আপত্তি-০৩: ভ্রূণ সৃষ্টি হয় শুধু পুরুষের বির্য থেকে

কুরআনে আছে, ভ্রূণ সৃষ্টি হয় نُطفة (নুতফাহ) থেকে। نُطفة (নুতফাহ) হল পুরুষের বির্য। নিঃসন্দেহে এটা ভুল ধারণা। শুধু পুরুষের বির্য নয়, বরং পুরুষের শুক্রাণু এবং নারীর ডিম্বাণু উভয়ের মিশ্রণে সৃষ্টি হয় ভ্রূণ।

তাদের এ কথা ভিত্তিহীন যে, نُطفة (নুতফাহ) হল, শুধু পুরুষের বির্য। বরং نُطفة (নুতফাহ) শব্দটি পুরুষ-নারী উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। হাদিসে আছে–

من كل يخلق الإنسان من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة

অর্থাৎ, পুরুষের নুতফা এবং নারীর নুতফা উভয় থেকেই সৃষ্টি করা হয় মানুষ।[৩২]

উক্ত হাদিসে পুরুষের বির্য (শুক্রাণু) এবং নারীর বির্য (ডিম্বাণু) উভয়টা নির্দেশ করার জন্য নুতফা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আছে, সুরা দাহর, সুরা-৭৬, আয়াত-২:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত নুতফা (বির্য) থেকে।

কোন সন্দেহ নেই, কুরআনে ‘মিশ্রিত বির্য’ বলতে পুরুষ-নারী উভয়ের বির্য বোঝানো হয়েছে।

আপত্তি-০৪: ভ্রূণ সৃষ্টি হয় বির্য থেকে!

---

[৩২] মুসনাদে আহমাদ-হাদিস-৪৪৩৮। আস সুনানুল কুবরা নাসায়ী, হাদিস-৯০৭৫। আবুশ শায়খ, হাদিস-১০৭২৮।

কুরআনে আছে, ভ্রূণ সৃষ্টি হয় نُطفة (নুতফা) থেকে। نُطفة (নুতফা)–র অর্থ, বির্য। এটা ভুল ধারণা। মানুষ আগে ধারণা করত বির্য থেকে সৃষ্টি হয় ভ্রণ। সঠিক হল, ভ্রূণ সৃষ্টি হয় বির্যের মধ্যে থাকা শুক্রাণু থেকে।

আপত্তিটার মূলে রয়েছে কুরআন শরিফের আংশিক অধ্যয়ন। কুরআনের এবিষয়ক সকল আয়াত ও বক্তব্য সামনে রাখলে তাদের আপত্তিটি অমূলক প্রমাণিত হয়।

কুরআনের অনেক জায়গায় যদিও বলা হয়েছে বির্য থেকে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভ্রূণ সৃষ্টি হয় পুরো বির্য থেকে না বির্যের একটা অংশ থেকে, কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট তা করে দেয়া হয়েছে।

সুরা সাজদায় আছে, সুরা-৩২, আয়াত-৭-৮:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ *

অর্থাৎ,যিনি সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুকে ভালোভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন মৃত্তিকা থেকে। এরপর তার সন্তানসন্ততিকে সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানি (বির্য)–র নির্যাস থেকে।

উল্লিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, ভ্রূণ সৃষ্টি করা হয় বির্যের নির্বাচিত নির্যাস থেকে। এই নির্বাচিত নির্যাসই হল, শুক্রাণু।

ছহিহ মুসলিমে আছে, হাদিস-১৪৩৮:

ما من كل الماء يكون الولد

পুরো পানি (বির্য) থেকে সন্তান হয় না।

অতএব যারা বলে, কুরআনে আছে, মানুষ সৃষ্টি হয় সমগ্র বির্য থেকে। তাদের ধারণা অমূলক ও ভিত্তিহীন। বরং কুরআনে বলা হয়েছে বির্যের নির্বাচিত নির্যাস, যা হল শুক্রাণু। তদুপরি কুরআনে ‘নির্বাচিত’ বলে ইশারা করা হয়েছে, সব শুক্রাণু থেকে নয়, বরং নির্বাচিত শুক্রাণু থেকে সৃষ্টি হয় ভ্রূণ।

আপত্তি-০৫: হাড় আগে না মাংস আগে?

কুরআন মাজিদে সুরা মুমিনুনে আছে, সুরা-২৩, আয়াত-১২-১৪:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ *

আমি মানুষকে

১. মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।
অতপর আমি তাকে

২. শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।
এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে

৩. জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি,
অতপর জমাট রক্তকে

৪. মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি,
এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে

৫. অস্থি সৃষ্টি করেছি,
অতপর অস্থিকে

৬. মাংস দ্বারা আবৃত করেছি,

অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।

উল্লিখিত বক্তব্যে প্রথমে হাড় ও পরে হাড়ের ওপর মাংস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এর ওপর কোন কোন অমুসলিম আপত্তি করে, প্রথমে হাড়, পরে হাড়ে মাংস স্থাপন কথাটি ভুল। বরং প্রথমে মাংস, পরে মাংসে হাড় তৈরি হয়।

এ আপত্তিটা জ্বলন্ত প্রমাণ, কুরআনের ওপর যারা আপত্তি করে তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতাবশতই আপত্তি করে। হাড়-মাংস–এধাপটি ১০০% সঠিক, বাস্তব

ও বিজ্ঞানম্মত। ভ্রূণবিদ্যায় যুগের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী ড. ক্ষিত মুড় তার বিখ্যাত গ্রন্থ the developing humen–এ উল্লেখ করেন–

During the seventh week, the skeleton begins to spread throughout the body and the bones take their familiar shapes. At the end of the seventh week and during the eight week the muscles take their positions around the bone forms

সপ্তম সপ্তাহে, কঙ্কাল সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং হাড়গুলি তাদের পরিচিত আকারগুলি গ্রহণ করে। সপ্তম সপ্তাহের শেষে এবং অষ্টম সপ্তাহের সময় মাংসপেশি হাড়ের চারপাশে অবস্থান নেয়।

ভ্রূণ গবেষণার একটি অনন্য ওয়েবসাইট right to life–এ Human Development:Life in the Womb শিরোনামে ভ্রূণ সৃষ্টির ধাপ নিয়ে সবিশদ আলোচনা করা হয়। এতে আছে , Week 6-7 of Life

Did you know the oldest bones in your body are your collar bone and jaw? These bones begin to develop in the womb by 7 weeks after fertilization

অর্থাৎঃ আপনি জানেন কি, আপনার শরীরের সবচেয়ে পুরনো হাড় আপনার কলার হাড় (কাঁধ ও বক্ষাস্থি সংযোগকারী হাড়) এবং চোয়ালের হাড়, এই হাড়সমূহ গর্ভাশয়ে গর্ভাধানের ৭ম সপ্তাহের পর বিকাশ শুরু করে?

এরপরে বলা হয়, Week 7-8 of Life:

From 7 to 7½ weeks, tendons attach leg muscles to bones, and knee joints appear

'৭ থেকে ৭.৫ সপ্তাহের মধ্যে টেনডন (শক্ত ও মোটা তন্তু যা দিয়ে মাংসপেশী হাড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে) মাংসপেশীকে হাড়ের সঙ্গে যুক্ত করা শুরু করে এবং হাঁটুর জয়েন্ট দেখা দেয়।'[৩৩]

---

[৩৩] www.ckrtl.org/life-issues/human-development-2/human-development-life-in-the-wo...

আপত্তি-০৬:ভ্রূণের মনুষ্যরূপ ধারণের সময়

হাদিসে আছে,

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ. قَالَ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَيَقْضِى رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ

অর্থাৎ, যখন ভ্রূণের ওপর দিয়ে ৪২ দিন অতিক্রান্ত হয়, আল্লাহ তখন তার কাছে একজন ফেরেস্তা পাঠান। সে তার আকৃতি দেয়। তার কান, চোখ, চামড়া, মাংস ও হাড় সৃষ্টি করে। এরপর ফেরেস্তা জিজ্ঞেস করে, হে রব! ছেলে হবে না মেয়ে? এরপর তোমার রব যা চান আদেশ দেন আর ফেরেস্তা তা লিখে রাখে।

সংশয়বাদীরা এই হাদিসকে সন্দেহ করছে। বিজ্ঞান বিরোধী বলে বারবার আওয়াজ তুলছে।

বাস্তব সত্য হল, বিজ্ঞান যত উন্নতি করে ততই তা কুরআন-হাদিসের তথ্যের রহস্য ও দিগন্ত উন্মোচিত করে।

আধুনিক বিজ্ঞান হুবহু এই কথাই বলছে, বিয়াল্লিশ দিন পর ভ্রূণের কান, চোখ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। লিঙ্গ সৃষ্টির ধাপ বিয়াল্লিশ দিন পরে শুরু হয়–আগে নয়। মোটকথা, ভ্রূণ মনুষ্যরূপ লাভ করে বিয়াল্লিশ দিন পরে। বিয়াল্লিশ দিন আগে নয়।

During the sixth week after fertilization the unborn child can respond to local tactile stimulation by reflex movements. At the end of the sixth week, the unborn child is clearly recognizable as a human being by gross morphological observation.

অর্থাৎ, গর্ভাধানের পর ৬ সপ্তাহের মধ্যে অনাগত শিশু প্রতিবর্তী বা ইচ্ছানিরপেক্ষ নড়াচড়ার মাধ্যমে স্পর্শগ্রাহ্য উদ্দীপনার সাড়া দিতে পারে। ষষ্ঠ সপ্তাহের পরে অনাগত শিশুটি স্পষ্টভাবে মনুষ্যরূপে চিহ্নিত হয়–সরাসরি

মরফলজিকেল (মরফলজি, জীববিদ্যার যে শাখা প্রাণী ও উদ্ভিদের আকৃতি ও গঠন নিয়ে কাজ করে) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এমনটা জানা গেছে।[৩৪]

এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, ভ্রূণ মনুষ্যরূপ ৪২ দিন পরেই ধারণ করে।

ক্ষিত মুড় লেখেন- The eye is obvious, About day 42 after fertilization,অর্থাৎ,গর্ভাধানের ৪২ দিন পর চোখ স্পষ্ট হয়।

বাংলাদেশে অনেক 'মাতুব্বর' আছে, যারা বিজ্ঞান না জেনেও নিজেদেরকে এরিস্টটল কিংবা সক্রেটিস ভাবতে ভুল করে না। ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো যায়। কিন্তু 'ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকা' লোককে জাগানো যায় না। ইসলামের বিজ্ঞান গবেষকরা কুরআন মাজিদের ভ্রূণ সৃষ্টি তথ্য অমুসলিম বিজ্ঞানীদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানীরা অকুণ্ঠ চিত্তে তার যথার্থতা মেনেও নিয়েছে। কিন্তু অসম্ভব ওদের বোঝানো। কারণ ওরা বিজ্ঞানী নয়। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীর ভাব নিয়ে কথা বলে! তাই বুঝতে চায় না। বুঝতেও পারে না। এখানে আমরা সমকালিন বিশ্বের ভ্রূণবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কতিপয় বিজ্ঞানীর সাক্ষ্য তুলে ধরছি।

প্রফেসর মারশাল জনসন (Dr. E. Marshall Johnson)[৩৫]

ইয়েমেনের 'আল ঈমান ইউনিভার্সিটি'র পরিচালক আব্দুল মাজিদ যিনদানি বলেন, 'কুরআন-হাদিসে বিজ্ঞানের দর্পণ' (scientific signs in the quran and the sunnah) বিষয়ে অনুষ্ঠিত 'অষ্টম সউদি চিকিৎসা বিজ্ঞান সভায়' প্রফেসর মারশাল জনসনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের এই সভার আলোচ্য বিষয় কী?

আমরা বললাম, ১৪০০ বছর আগের কুরআন-হাদিসের তথ্য ও মডার্ন সাইন্সের তথ্যের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণ করা।

---

[৩৪] www.aproundtable.org/blog/blog.cfm?ID=894&AUTHOR_ID=1

[৩৫]- ড. মারশাল জনসন থমাস জেফার্সন ইউনিভার্সিটি, ফিলাডেলফিয়া, পেনসিলভানিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের ইমেরিটাস প্রফেসর। সেখানে তিনি বাইশ বছর ধরে এনাটমির প্রফেসর, এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান এবং Daniel Baugh Institute-র পরিচালক ছিলেন।

তিনি বললেন কী?!

আমরা বললাম, যেমন: বিজ্ঞান বলে মানুষ মায়ের গর্ভে স্টেইজ বাই স্টেইজ সৃষ্টি হয়। আর কুরআন সেই স্টেইজ ও ধাপগুলোই ১৪০০ বছর আগে বলে দিয়েছে।

কথাগুলো শোনামাত্রই তিনি বসা থেকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন, নো। নো। নো।

আমরা তাকে বললাম, বসুন ডক্টর..!!

তিনি বললেন, না। আমি বসব না। তোমরা এ কেমনতর কথা বলছ?

আমরা তার দিকে ওঠে গেলাম। কুরআন শরিফ তার সামনে পেশ করে বললাম এই দেখুন আল্লাহ তায়ালা বলছেন–

ما لكم لا تَرْجُوْنَ للهِ وَقاراً * وقد خلقكم أَطْوَاراً*

অর্থাৎ, তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর মহিমাকে বিলকুল ভয় পাও না? অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে (সুরা নুহ ১৩-১৪)।

তিনি ইংলিশে আয়াতগুলোর অর্থ পড়লেন। এরপর আমরা কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলাম– يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে এভাবে সৃষ্টি করলেন যে, তিন অন্ধকারের মধ্যে তোমরা একের পর এক সৃজন স্তর অতিক্রম কর (সূরা আয-যুমার :৬)।

তিনি বললেন, কিন্তু এর পেছনে তিনটি ব্যখ্যা থাকতে পারে।

প্রথমত, এসব কথা কুরআনে অপ্রত্যাশিতভাবেই চলে এসেছে।

আমরা পঁচিশটিরও বেশি আয়াত জমা করলাম। তার সামনে আয়াতগুলো রেখে বললাম, এসকল আয়াত কি অপ্রত্যাশিতভাবেই উল্লিখিত হয়ে থাকবে? অধিকন্তু কুরআনে এসব ধাপের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

১. নুতফা।
২. আলাকা।
৩. মুদগা।
৪. হাড়।

৫. হাড়ে গোস্ত স্থাপন।

ভ্রূণসৃষ্টির সমূহধাপ, ধাপগুলোর নাম এসব কি অপ্রত্যাশিতভাবেই উল্লিখিত হয়েছে?

তিনি বললেন, না।

আমরা বললাম, আর কী ব্যখ্যা হতে পারে?

তিনি বললেন, দ্বিতীয়ত, সম্ভাবনা আছে, মুহাম্মাদের কাছে বড় দুরবিন ছিল।

আমরা বললাম, জ্বী, ভ্রূণের এসব ধাপ এবং বিজ্ঞানের আলোকে আবিষ্কৃত এসব তথ্য ও বিশদ বিবরণ কেবল বৃহৎ দুরবিনের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব; তার কাছে দুরবিন কীভাবেই বা থাকবে, অথচ এজন্যে প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তির, যার প্রতিফলন ঘটার কথা ছিল তার পানাহারে, যুদ্ধ বিগ্রহে ও সন্ধি-চুক্তিতে। তদুপরি তাকে তা গ্রহণ করতে হত তার আগের কারো কাছ থেকে এবং তিনি তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অর্পণও করে যেতেন। এধরনের তো কিছুই হয়নি।

এ কথা শুনে তিনি হেসে ফেললেন এবং বললেন, আমি একটি প্রদর্শনীতে পৃথিবীর সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত দুরবিনটি দেখেছিলাম, যা বেশি বড় ছিল না। তদুপরি এর ধারণকৃত ছবি পষ্ট দেখাত না।

এরপর তিনি বললেন, না। মুহাম্মাদের কাছে কোন যন্ত্র বা দুরবিন থাকতে পারে না। তা হলে আমাদের জন্য এটা বলা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই যে, তিনি আল্লাহর রসুল।[৩৬]

French Medical Association (ফ্রান্স চিকিৎসা সংস্থা)

আরববিশ্বের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রিফআত সাইয়িদ আওদি বলেন,

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত International Labour Organization–র একটি সভায় ড. মুরিচ বুকাইলির সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তার গ্রন্থ বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান (The Bible, the

---

36 আন্নাহুল হাক্ব, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, শায়খ যিনদানি।

Qur'an and Science: The Holy Scripture Examined in the Light of Modern Knowledge) সম্পর্কে আলোচনা উঠালাম। তিনি আমাকে বললেন, তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। ইসলাম গ্রহণ করেছেন বইটি লেখার আরও কয়েক বছর পর।

ফ্রান্সে বিশেষত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মাঝে বইটির ব্যাপারে কী প্রতিক্রীয়া দেখা দিয়েছে, বইটির এরকম বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে সাগ্রহে বললেন, কুরআনের ভ্রূণ সৃষ্টি তথ্যের আলোকে আমি আমার গ্রন্থে যা লিখেছি, এর ওপর একটি বক্তৃতা দিয়েছি–বক্তৃতা দিয়েছি French Medical Association–র একটি সভায়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান, ফ্রান্স চিকিৎসা সংস্থা কী? তার কথায় বোঝা গেল, ফ্রান্স চিকিৎসা সংস্থার সদস্যদের সাথে ফ্রান্সের চিকিৎসকদের তুলনা করা যায় না।

মুরিচ বুকাইলি বলেন, যখন তিনি ফ্রান্স চিকিৎসা সংস্থার সদস্যদের সামনে ভ্রূণসৃষ্টির ধাপসমূহ উপস্থাপন করলেন; কুরআন কারিমে সুরা মুমিনে সেসব যেভাবে বর্ণিত হয়েছে। তখন উপস্থিত সকল সদস্য ঐকমত্য পোষণ করে বলেন, সবধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করে চিকিৎসা বিজ্ঞান সর্বশেষ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, তার সাথে কুরআনের হুবহু মিল রয়েছে।

মুরিচ বুকাইলি বলেন, ফ্রান্স চিকিৎসা সংস্থার যেসব সদস্য তার লেকচার শুনেছিল, তারা প্রশ্ন তুলল, তুমি যা বলছ, তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ঠিক, কিন্তু কী প্রমাণ আছে, তুমি যে গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিচ্ছ, তা চৌদ্দশ' বছর আগে লেখা হয়েছে, আধুনিক যুগে লেখা হয়নি?

মুরিচ বুকাইলি বলেন, তাদের কথায় সুস্পষ্ট হয়ে গেল, তারা বলছে, কুরআনের ভ্রূণসৃষ্টির স্তরসমূহ সঠিক। বাকি থাকল, কুরআনের ঐতিহাসিক সত্যতা। বুকাইলি বলেন, কুরআন কারিমের ঐতিহাসিক সত্যতা, ইউরোপের গ্রন্থগারসমূহে বিশেষকরে ফ্রান্সের গ্রন্থাগারসমূহে কুরআনের

বিদ্যমান পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে তিনি ফ্রান্স চিকিৎসা সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।[৩৭]

ড. ক্ষিত মুড় (Keith Moore)[৩৮]

The Developing Human with Islamic Additions এর ভূমিকায় ড. ক্ষিত মুড় লেখেন, 'গত তিন বছর ধরে আমি কিং আব্দুল আযিয ইউনিভার্সিটি (জেদ্দা, সউদি আরব)-র সঙ্গে কাজ করে আসছি। কুরআন-সুন্নাহে মানব জন্মপূর্ব বিকাশ সম্পর্কিত বক্তব্য ব্যাখ্যায় সহযোগিতা করে আসছি তাদের।

ভ্রূণবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সপ্তম শতকে বিবৃত এসব বক্তব্যের যথার্থতা দেখে আমি প্রথমে অভিভূত হয়েছিলাম। যদিও আমি দশম শতকের মুসলিম বিজ্ঞানীদের সোনালী ইতিহাস, চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাদের কারো কারো অংশগ্রহণ সম্পর্কে অবহিত ছিলাম কিন্তু কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও বাস্তব জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না আমার।

কুরআনে ভ্রূণসৃষ্টি সম্পর্কিত আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর এসব বক্তব্যের মর্ম অনুধাবন করা মুসলিম অমুসলিম সব ছাত্রের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

শায়খ যিনদানি অনূদিত কুরআন-সুন্নাহের এসব বক্তব্যের ব্যাখ্য আমার দৃষ্টিতে সঠিক।'

---

37 - সূত্রঃ আল হাইআতুল আলামিয়্যা ফিল কোরআন ওয়াস সুন্নাহ (Commission on Scientific Signs in the Quran and Sunnah) থেকে প্রকাশিত পত্রিকা আল ই'জায আল ইলমি, সংখ্যা-৩৪, রামাযান, ১৪৩০ হিজরি। উক্ত পত্রিকায় সাইয়িদ আওদি নিজ কলমে মুরিচি বুকাইলির সাথে তার উপরিউক্ত সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন।

৩৮ Professor Emeritus, Division of Anatomy, Department of Surgery, Faculty of Medicine, University of Toronto, Tronto, Ontario, Canada.
Former Professor and Head, Department of Anatomy, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, canada
Former Professor and Chairman, Department of Anatomy, and Cell Biology, University of Tronto, Tronto, Ontario, canada

ইসলামের ছায়াতলে অমুসলিম বিজ্ঞানী

বিস্ময়ের বিস্ময় পবিত্র কুরআন। শত যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সগৌরবে এগোচ্ছে কুরআন। আজ এ বিজ্ঞানের যুগে ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলোর ভিত বিজ্ঞানের ধাক্কায় যখন মাটির সাথে মিশে গেছে, কুরআন তখন বিকিরণ করে যাচ্ছে নতুন শতাব্দীর জন্য নতুন আলো। তার সে আলোয় আলোকিত হচ্ছে আঁধার পথের কত পথিক!

সত্য ও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কুরআনের প্রতিপক্ষ নয় বরং ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ধীরে ধীরে জেনে যাচ্ছে পৃথিবীর মানুষ। অমুসলিম বিজ্ঞানী তার 'আবিষ্কৃত বিজ্ঞানে'র দেখা পায় যখন কুরআন মাজিদে, সে বিস্ময়ে বলে ওঠে, আরে এটা কুরআনে আসবে কোত্থেকে, এটা তো মাত্র আমি আবিষ্কার করলাম!

ফলাফল কী দাঁড়ায়? তার সেই বিজ্ঞান তাকে নিয়ে যায় ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। আজ এমনই কয়েকজন

বিজ্ঞানীর সাথে পরিচয় করাব আপনাদের।

নাস্তিক্যবাদ তোমার কাছে এত মধুর কেন? নাস্তিক্যবাদে তোমার এত গর্ব কেন? তুমি মনে করছ পৃথিবীকে তুমি আলোকিত করছ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি নিজেকে ঠেলে দিচ্ছ ঘোর বিপদের মুখে। আর পৃথিবীকে ভরে দিচ্ছ বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞতার অন্ধকারে। ঘোর নাস্তিক এন্টনি ফ্লু তার জীবনের সাতটি দশক অতিবাহিত করেছেন নাস্তিক্যবাদ প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে তিনি কেন নাস্তিক্যবাদ বিসর্জন দিলেন? আর কেনই-বা লিখেন there is a god। কিন্তু এমন ক'জন?

বিজ্ঞানের উৎকর্ষের এই যুগে কত মানুষ মেতে উঠছে অবিশ্বাসবাদে! ওরা হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তুমি কেন হারিয়ে যেতে চাও? ওরা ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু ডুবে মরতে চাও কেন তুমি?

তুমি তোমার চিন্তাশক্তি শানিত করো। বিবেকের দ্বার উন্মুক্ত করো। চিন্তার পরিধী বিস্তৃত করো। আর দেখো জগৎ ও জগতের সৃষ্টি। তোমার মধ্যে যদি সত্যের প্রতি বিদ্বেষ না থাকে, তা হলে একসময় তোমার কান শুনবে অভূতপূর্ব একটি ধ্বনি–তোমার মুখ বলছে, আহা! কী সুমহান তুমি হে স্রষ্টা! কী বিস্ময়কর তোমার সৃষ্টিকুশলতা! কোথায় তুমি? কীভাবে পাবো তোমায়?

কুরআন অনেকেই পড়ে। পড় তুমিও। তারা আল্লাহর পরিচয় লাভে ধন্য হয়। কিন্তু তুমি কেন থাক বঞ্চিত? রহস্য কি জানতে চাও? তা হলে শোন। তোমার বদ্ধমূল বিশ্বাস, কুরআন কারিম সৃষ্টিকর্তার বাণী হতেই পারে না। তাই তুমি কুরআন পড় নিরেট ভুল খোঁজার দৃষ্টিতে। সত্য কিছু পেলেও তুমি আপ্রাণ চেষ্টা কর তা ভুল প্রমাণিত করতে। এভাবে তো তুমি সত্যের দেখা পাবে না বন্ধু।

তুমি তোমার হৃদয় 'মুক্ত' ও 'শূন্য' কর। উন্মুক্ত ভাবনায় কুরআন পড়। দেখ কুরআন কী উপহার দেয় তোমাকে। এই একুশ শতকেও অনেকে যখন কুরআন ও ইসলাম থেকে দূরে থাকে শুধু বিজ্ঞান বিজ্ঞান বলে। তখনি আরেকদল বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানপ্রেমীকে দেখা যায়, কুরআনের বিজ্ঞানময় বয়ান-বিবৃতিতে মুগ্ধ, অভিভূত। সুতরাং শোনা কথায় কান না দিয়ে, কুরআন বিদ্বেষী বইপুস্তকে নির্ভর না করে তুমি মুক্ত মনে কুরআন পড়। যেমন পড়েছে টেজাটাট টেজাসেন, গেরি মিলারসহ অনেক বিজ্ঞানী ও

বিজ্ঞানপ্রেমী। তা হলে তাদের মত তুমিও হতে পারবে কুরআনের আলোয় আলোকিত। তোমার শ্বস্তি ও আশ্বস্তির জন্য এখানে তুলে দিচ্ছি তাদের কয়েকজনের চাঞ্চল্যকর কাহিনী।

ড. রিচার্ড ফিরলি

ড. রিচার্ড ফিরলি[৩৯] বলেন, ১৯৮০ এবং ১৯৮২ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমি ব্রিটেনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ইকসটের ইউনিভার্সিটিতে জিওলজী ও ভূতত্ত্ব অধ্যয়ন করি। আমার জানা ছিল না, আমার এই অধ্যয়ন ও গবেষণাই আমার আলোর পথ দেখার কারণ হয়ে উঠবে। আমি জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে পুলিশ অফিসার হিসেবে কাজ শুরু করি। আমি জানতাম না, এর মধ্যেই আল্লাহতায়ালা আমার জন্য সেই অলৌকিক জিনিসটির দর্শন সৌভাগ্য নিহিত রেখেছেন, যা ১৪০০ বছর ধরে তেলাওয়াত করে আসা হচ্ছে। ঘটনা হল, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বরে লন্ডনে ভারত বংশোদ্ভূত এক ব্রিটেন লেখকের একটি বই ছাপা হয় যা মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। মুসলমানদেরকে বইটি কেন বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, এর রহস্য উদ্ঘাটন হেতু বইটি পড়া আমার জরুরি ছিল। সাথে সাথে কুরআনও–আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে মুসলমানরা যা বিশ্বাস করে এবং যার ব্যাপারে সেই বইটাতে বিষোদ্গার করা হয়েছে। তখনও আমি জানতাম না, আমার অপেক্ষায় রয়েছে এমন তিনটি আয়াত যা আমার বুদ্ধির দিগন্ত খুলে দেবে এবং আলোর পথ দেখিয়ে দেবে।

প্রথম আয়াত:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

অর্থাৎ, আমি কি ভূমিকে শয্যা বানাইনি? এবং পাহাড়সমূহকে কীলক?

আমি গভীরভাবে এর ব্যাখ্যা জানলাম এবং ভূতত্ত্ব পড়ার সময় যা পড়লাম তা মনে করলাম। তদুপরি এবিষয়ে রচিত একাধিক বই পড়লাম। তো

[৩৯] ড. রিচার্ড ফেরলি (Richard Fairley) সাবেক প্রধান পরিদর্শক: সন্ত্রাস বিরোধী স্কোয়াড anti-terrorism squad), ব্রিটেন।

এবিষয়ে যা জানলাম তা হল, একটি পাহাড় বাহ্যিকভাবে যা দেখা যায় বাস্তবে তা এরচে অনেক অনেক বড়। আর এই থিওরিটি আবিষ্কৃত হয়েছে কেবল উনিশ শতকের শেষ দিকে ।

এই আবিষ্কারের ফলে মানুষ নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছে, প্রতিটি পাহাড়ের রয়েছে শিকড়—মাটির অনেক গভীরে প্রোথিত, যা পাহাড়ের বাহ্যিক রূপের ১৫ গুণ বড়। তদুপরি ভূমির 'পাথুরে স্তরের' আকস্মিক কম্পন রোধে পাহাড়ের বিরাট বড় ভূমিকা রয়েছে। আমি মনে মনে বললাম এসব তথ্য আবিষ্কৃত হবার শত শত বছর পূর্বেই নিরক্ষর একজন লোক এসব জানল কীভাবে!

দ্বিতীয় আয়াত:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

অর্থাৎঃ আমি আকাশকে নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং নিশ্চয়ই আমি বিস্তৃতিদাতা (সুরা যারিয়াত-৪৭)।

কয়েক মাসব্যাপী অধ্যয়ন থেকে জানতে পারলাম, বিজ্ঞানী এডওয়েন হাবল আবিষ্কার করেছেন, এসব কোটি কোটি গ্যালাক্সী অব্যাহতভাবে পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। যদ্দরুন বোঝা যায়, পৃথিবী বাস্তবেই প্রসারিত হচ্ছে। বিস্তৃতি লাভ করছে।

তৃতীয় আয়াত:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাসী তারা কি দেখে না যে, ভূমি এবং সমূহ আকাশ একসময় পুঞ্জীভূত ছিল। পরে আমরা উভয়টাকে বিচ্ছিন্ন করি এবং পানি থেকে প্রতিটি প্রাণবান বস্তু সৃষ্টি করি। তারপরেও কি তারা ঈমান আনবে না ?[৪০]

আয়াতটির ব্যাখ্যা পড়ে জানতে পারলাম যে, রাতক অর্থ হল: পুঞ্জীভূত হওয়া, একটির সাথে আরেকটি লেগে থাকা। আর ফাতক অর্থ হল: পৃথক

---

৪০. সূরা আম্বিয়া, সূ-২১, আয়াত-৩০।

করা, বিচ্ছন্ন করা। এটা Big Bang তথা মহা বিস্ফোরণ মতবাদের প্রতি নির্দেশ করছে। যার মর্ম হল, সৃষ্টির শুরুতে ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডল পুঞ্জীভূত ছিল। পরে মহাবিস্ফোরণের সাহায্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে।

প্রতিরাতেই আমি কোরআনের পূর্ণ এক পারা বিচার-বিশ্লেষণ করে পড়তাম। মাঝেমধ্যে লন্ডনে রিজনেট পার্কের কাছে অবস্থিত ইসলামিক কেন্দ্রে যাতায়াত করতাম। দীর্ঘ দুবছর ধরে কোরআন গবেষণা করবার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করি।[৪১]

ড. গেরি মিলার

ড. গেরি মিলার[৪২] একদিন ভুল বের করার উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফ খুললেন; যাতে ভুল পাওয়া গেলে মুসলমানদেরকে খ্রিস্টানধর্মে দাওয়াত দেয়া সহজ হয়। তার ধারণা ছিল, কোরআন যেহেতু ১৪০০ বছর আগের গ্রন্থ, তাই তাতে থাকবে সাধারণ ও স্থূল কথাবার্তা। কিন্তু তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন, যখন দেখলেন, কোরআন মাজিদে এমন সব তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে, যা পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তার ধারণা ছিল, কোরআন শরীফে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে ঘটে যাওয়া কোন বেদনাবিধুর কাহিনীর উল্লেখ থাকবে। যেমনঃ তার স্ত্রী খাদিজার মৃত্যু, তার ছেলেসন্তানের মৃত্যু। কিন্তু তিনি এমন কিছুই পাননি।

কোরআনের ভুল ধরার নিয়তে তিনি আরও সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টিতে কোরআন পড়তে লাগলেন। কিন্তু তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন যখন কুরআনের এই আয়াতটি তার চোখে পড়লো–

---

[৪১] কাহিনীটি আরব বিশ্বের জাতীয় পত্রিকা "আশ-শারকুল আওসাত" এ বিস্তারিত ছেপেছে। পত্রিকাটি আমি পড়েছি। আরও দেখুন,https://www.youtube.com/watch?v=SP1vtVCVXPs
www.alarabiya.net/articles/2010/02/13/100286.html

[৪২] **সাবেক খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক,** Toronto University**-র গণিত ও লজিকের লেকচারার । সদস্যঃ ডিপার্টমেন্ট অব মেথমেটিকস শিক্ষা পরিষদ, কিং ফয়সাল ইউনিভার্সিটি ফর অয়েল এন্ড মিনারেল ।**

أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

অর্থাৎ, তারা কি ভেবেচিন্তে কোরআন পড়ে না, যদি এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তা হলে তাতে অনেক বৈসাদৃশ্য পেতো?

ড. গেরি মিলার বলেন, বর্তমানে বৈজ্ঞানিক একটি মতবাদ হল 'ভুল বের করণ মতবাদ' (Falsification theory)। আশ্চর্য হল, কুরআন শরিফ মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকেই তাতে ভুল বের করার প্রতি আহবান করছে। তিনি আরও বলেন, পৃথিবীতে এমন কোন লেখক পাওয়া যাবে না, যে কোন বই লিখে তাতে কোন ধরণের ভুল থাকতে পারবে না বলে দুঃসাহসিকতা দেখাতে পারে।

কুরআন মাজিদের আরেকটি আয়াত তাকে ভাবিয়ে তোলে। আয়াতটি হল,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ

তিনি বলেন, আয়াতটির প্রথমাংশ 'মহাবিস্ফোরণ মতবাদের' প্রতি নির্দেশ করছে, যার অর্থ হল, সৃষ্টির শুরুতে সবকিছু পুঞ্জীভূত ছিল। পরে মহাবিস্ফোরণের সাহায্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন তারকা, গ্রহউপগ্রহ তৈরি হতে শুরু করে।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে যার চূড়ান্ত আবিষ্কারকারকদের নোবেল প্রাইজে ভূষিত করা হয়। আয়াতের মধ্যে 'রাতকে'র অর্থ হল, পরস্পর লেগে থাকা বস্তু। পক্ষান্তরে 'ফাতকে'র অর্থ হল, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বস্তু। যা বৈজ্ঞানিভাবে প্রমাণিত 'মহাবিস্ফোরণ মতবাদের' সাথে অনায়াসেই মিলে যায়।

আয়াতটির দ্বিতীয়াংশে পানিকে জীবনের উৎস বলা হয়েছে। ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্যজনক। কারণ আমরা তো আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমেই জানতে পেরেছি যে, জীবকোষ প্রধানত Cytoplasm দিয়ে গঠিত, যা প্রধানত পানি দিয়ে গঠিত। ভাবার বিষয় হল, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি না আসতো তা হলে ১৪০০ বছর আগে, নিরক্ষর হয়ে এত সব কীভাবে জানলো?

ড. গেরি মিলার কোরআন মাজিদে এসব বৈজ্ঞানিক সত্যের সাক্ষাৎ পেয়ে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪৩]

প্রফেসর টেজাটাট টেজাসেন (Professor Tejatat Tejasen)[৪৪]

আব্দুল মাজিদ যিনদানি প্রফেসর টেজাটাট টেজাসেনের সামনে ভ্রূণসৃষ্টি সম্পর্কিত হাদিস এবং কুরআনের আয়াত পেশ করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, আমাদের বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলোতেও ভ্রূণসৃষ্টির ধাপসমূহ সম্পর্কে সূক্ষ্ম আলোচনা রয়েছে।

আব্দুল মাজিদ যিনদানি তাকে বললেন, আমরা সেসব গ্রন্থগুলোর বিবরণ জানতে খুবই আগ্রহী। এক বছর পর তিনি যখন কিং আব্দুল আযিয ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের বহিরাগত পরীক্ষক (external examiner) হিসেবে জিদ্দায় আসলেন। তখন তিনি ওজর পেশ করে বললেন, আসলে এ বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই আমি আপনাদের জবাবদিয়ে ছিলাম। আমি যখন গবেষণা চালালাম তখন বিষয়টি সম্পর্কে কোন বিবরণই সেসব গ্রন্থে পাইনি।

আমরা ড.ক্ষিত মোর প্রদত্ত 'কোরআন হাদিসে ভ্রূণ সৃষ্টির বিবরণ: বিজ্ঞান কী বলে' বিষয়ক একটি লেকচার তার সামনে পেশ করে জিজ্ঞেস করলাম আপনি ড.ক্ষিত মোরকে চিনেন তো?

তিনি বললেন হ্যাঁ। ড. ক্ষিত মোর এবিষয়ের পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী।

তিনি লেকচারটি দেখার পর খুবই প্রভাবিত হলেন। পরে আমরা তাকে তার বিশেষজ্ঞতা অর্জন করা বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম।

---

[৪৩] ইযহারুল হাক্ব: ক্বাসাবিসা ওয়া উলামা ওয়া মুসতাশরিকুন আশহারু ইসলামাহুম, পৃষ্ঠা-১৪-১৬।
https://www.youtube.com/watch?v=We3RxtyJMKA
www.islamforchristians.com/gary-miller-man-challenge..

[৪৪] প্রফেসর টেজাটাট টেজাসেন থাইল্যান্ড, চিয়াংমাইয়ে অবস্থিত চিয়াংমাই ইউটিভার্সিটির এনেটমি বিভাগের চেয়ারম্যান । পূর্বে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের ডিন ছিলেন।

একটি প্রশ্ন ছিল, আগুনে শরীরের চামড়া ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পর শাস্তিপ্রাপ্ত লোককে শাস্তি দেয়া হলে সে শরীরে আর ব্যথা অনুভব করে না, তাই না?

তিনি বললেন হ্যাঁ, চামড়া যদি একেবারেই পুড়ে যায়।

আমরা বললাম, কোরআন শরীফে ১৪০০ বছর আগেই এদিকে ইশারা করা হয়েছে, এতে আছে যে, কাফেরদেরকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া হবে, যখন তাদের চামড়া ভস্মীভূত হয়ে যাবে তখন তাদের শরীরে নতুন করে চামড়া দেয়া হবে যাতে তারা আগুনের শাস্তি ভোগ করতে পারে।

কুরআনের আয়াতটি হল,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

আমরা বললাম, আপনি কি একমত যে, আয়াতটিতে চামড়ার মাধ্যমেই ব্যথা অনুভব হয়ে থাকে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

তিনি বললেন হ্যাঁ, আমি একমত যে, চামড়ার ব্যথা অনুভব করার বিষয়টা অনেক আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে; কারণ কোরআনে উল্লেখ আছে যে, পাপীকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়ার সময় চামড়া পুড়ে গেলে নতুন করে চামড়া দিয়ে তাকে ঢেকে দেয়া হবে যাতে সে ব্যথা অনুভব করতে পারে। এর দ্বারা কি তা হলে এটাই বোঝা যায়, ১৪০০ বছর আগ থেকেই এবিষয়টা মুসলমানরা জানতো! এরপর আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা এটা কি সম্ভব, এ সকল তথ্য মুহাম্মদ কোন মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন ?

তিনি উত্তরে বললেন, অসম্ভব।

আমরা বললাম, তা হলে কোত্থেকে এসেছে?

তিনি বললেন, কোন মানুষের কাছ থেকে আসতে পারে না তা তো নিশ্চিত, কিন্তু তোমরাই বল দেখি কোত্থেকে এসেছে?

আমরা বললাম, আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে।

তিনি বললেন, আল্লাহ কে?

আমরা বললাম, আল্লাহ হলেন, এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্দেশ করে। জ্ঞানের কাজ নির্দেশ করে মহাজ্ঞানীর অস্তিত্ব। পৃথিবী সৃষ্টিতে দক্ষতা মহাদক্ষ ও মহাবিজ্ঞের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। তেমনিভাবে পৃথিবী সৃষ্টিতে সুসামঞ্জস্য ও পৃথিবী পরিচালনায় সুশৃঙ্খলাবস্থা সেই এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।

আমরা যা বললাম, তিনি তাতে আমাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেন। পরে তিনি স্বদেশে ফিরে গিয়ে কুরআনের ব্যাপারে যা জেনেছেন তার ওপর একাধিক লেকচার দিয়েছেন। আমরা জানতে পেরেছি, তার লেকচারের পর তার পাঁচজন ছাত্র ইসলাম গ্রহণ করে।

তিনি ১৪০৪ হিজরিতে অনুষ্ঠিত 'অষ্টম সউদি চিকিৎসা বিজ্ঞান সভায়' অংশ গ্রহণ করেন। 'কুরআন হাদিসের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা' বিষয়ে উপস্থিত মুসলিম অমুসলিম অধ্যাপকদের লেকচার শোনেন।

তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে তার লেকচার শেষ করেন 'গত তিন বছর ধরে আমি কুরআন শরিফের অনুবাদ পড়ার দিকে মনোযোগ দিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, ১৪০০ বছর আগে কুরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা অবশ্যই সত্য। মডার্ন সাইন্সের আলোকে কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব।

মুহাম্মাদ যেহেতু পড়ালেখা জানতেন না। সেহেতু বিনা দ্বিধায় বলা যায়, তিনি একজন রসুল। প্রতিটি বিষয় তিনি মহাজ্ঞানী সেই মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহির মাধ্যমেই জানতে পেরেছেন, আর সেই মহান স্রষ্টা হলেন আল্লাহ।

তাই আমি মনে করি এখনই আমার ঈমান আনার সময় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মোহাম্মাদ আল্লাহর রসূল।[৪৫]

ড. মুরিচ বুকাইলি[৪৬]

---

৪৫. https://www.youtube.com/watch?v=y_Xek3DGrao

৪৬. মুরিচ বুকাইলী (Maurice Bucaille)। জন্ম-১৯/৭/১৯২০, মৃত্যু-১৭/২/১৯৯৮। ফরাসি চিকিৎসক । মিশরতত্ত্বের ফরাসি সোসাইটির সদস্য এবং লেখক। ১৯৪৫-৮২ এ মেডিসিন চর্চা করেন এবং গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির উপর বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

যখন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করলেন তখন আশির শেষ দিকে ফ্রান্সের পক্ষ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষা চালাবার উদ্দেশ্যে মিসরের কাছে ফেরাউনের মমিটা চাওয়া হয়।

মমিটা ফ্রান্সের প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষাগারে আনা হয়। সেখানে মমি নিয়ে গবেষণা ও এর রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে দেশের সর্বোচ্চ প্রত্নতত্ত্ববিদ, শল্যচিকিৎসক, ময়নাতদন্তকারীরা উপস্থিত হয়। মমি নিয়ে গবেষণা করার জন্য যাকে প্রধান শল্যচিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় তিনি হলেন প্রফেসর মুরিচ বুকাইলি। অন্যান্য চিকিৎসকেরা যখন ব্যস্ত ছিলো মমির সংস্কার সাধনে, মুরিচ বুকাইলি তখন মগ্ন ছিল ফেরাউন মারা যাওয়ার রহস্য উদ্ঘাটনে।

অবশেষে রাতের শেষ প্রহরে উদ্ঘাটিত হল, তার শরীরে আছে লবণ। এটা সবচে বড় প্রমাণ, সে ডুবে মারা যায় এবং মারা যাবার পরপরই সমুদ্র থেকে তার লাশ তুলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

একটা বিষয় তাকে খুব ভাবিয়ে তুলল, অন্য কোন ফেরাউনের মমি সংরক্ষিত থাকল না, আর এই ফেরাউনের মমিটা যথারীতি সংরক্ষিত থাকল অথচ এ মারা গেছে সমুদ্রে ডুবে!

যাহোক ফেরাউন ডুবে মরেছিল এবং সমুদ্র থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল– ফেরাউন মারা যাবার পেছনে যখন তিনি এটাকে তার একটি অসাধারণ আবিষ্কার ভাবছিলেন এবং এনিয়ে একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করছিলেন তখনি একজন তাকে নিম্নস্বরে বলল, আস্তে ডাক্তার..! মুসলমানদের তো বলতে শোনা যায়, এই ফেরাউন ডুবেই মারা গিয়েছিলো!

তিনি কথাটি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, অসম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞান এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যতীত এমন বিষয় জানা সম্ভব নয়। তখন কেউ তাকে বলল, মুসলমানরা যে কুরআনে বিশ্বাস করে সে কোরআনে এই ফেরাউনের মারা যাওয়ার এবং তার লাশ সংরক্ষিত থাকার কাহিনী বর্ণিত আছে।

তিনি আরও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, এটা কীভাবে সম্ভব? ফেরাউনের এই মমি আবিষ্কৃতই হল ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে অথচ কুরআন তো তাদের মাঝে আছে ১৪০০ বছর আগ থেকেই! বিবেক এটা কীভাবে মেনে নেবে? প্রাচীন যুগের মিসরিরা তাদের বাদশা ফেরাউনদের

লাশ মমি করে রাখতো বিষয়টা স্বয়ং আরবরাই জানতে পেরেছে মাত্র কয়েক দশক আগে।

ড. মুরিচ বুকাইলি রাতটা ফেরাউনের লাশের পাশে বসেই কাটাচ্ছিলেন আর তন্ময় হয়ে ভাবছিলেন, ডুবে মারা যাওয়ার পর ফেরাউনের লাশ সংরক্ষিত থাকার বিষয়টি মুসলমানদের কুরআনে রয়েছে, অথচ বাইবেলে শুধু আছে, মুসা আলাইহিস সালামকে তাড়া করার সময় ফেরাউন ডুবে মারা গেছে, কিন্তু এরপর তার লাশের কী পরিণতি হয় এব্যাপারে বাইবেল একদম চুপ!

তিনি মনে মনে বলছিলেন, এটা কি যৌক্তিক যে, এটা সেই ফেরাউনের মমি যে মুসা আলাইহিস সালামকে তাড়া করছিল? এটাও কি যৌক্তিক যে, হাজার বছর আগেই মুহাম্মাদ এবিষয়টা জানত?

তিনি সে রাতে আর ঘুমোতে পারলেন না। সহকর্মী একজনকে বাইবেল নিয়ে আসতে বললেন। তিনি বাইবেল খুলে দেখলেন, যাত্রাপুস্তকের ১৪ নাম্বার অধ্যায়ের ২৮ নাম্বার পদে আছে, ‘সমুদ্রের পানি ফিরে এসে ফেরাউনের গোটা সৈন্যদলটাকে ডুবিয়ে দিল তাদের একজনও আর বেঁচে রইল না।’ না। বাইবেলেও ফেরাউনের লাশ অক্ষত থাকার ব্যাপারে কোন কিছুই বলা হয়নি।

ফেরাউনের মমিটি মিসরে ফিরিয়ে দেয়া হয়। বুকাইলি ময়নাতদন্ত ও শল্যচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করে এবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে সউদি আরবে ভ্রমণ করার ইচ্ছা করেন।

তিনি সেখানে পৌঁছে তাদের সাথে সর্বপ্রথম এবিষয়টি নিয়েই আলোচনা শুরু করেন যে, ফেরাউনের মমির ক্ষেত্রে তার একটি কৃতিত্ব হলো, তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন, সে ডুবে মারা যায়, এবং সমুদ্র থেকে তার লাশ উদ্ধার করে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

তখন উপস্থিত একজন কুরআন শরিফ এনে তার সামনে মেলে ধরলেন এবং আল্লাহ তায়ালার এই বাণীটি তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন–

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

অর্থাৎ, আজ আমি তোমার দেহটা বাঁচাব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তী কালের মানুষের জন্যে নিদর্শন হয়ে থাক। যদিও আমার নিদর্শন থেকে অনেক মানুষ গাফেল হয়ে আছে।

এ আয়াতটি শুনে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন ।

মুরিচ বুকাইলি ফ্রান্সে ফিরে এলেন এক নতুন মন ও মনন নিয়ে। সেখানে তিনি কোরআন ও বিজ্ঞানের বিরোধ ও সাদৃশ্য নিয়ে দীর্ঘ দশ বছর গবেষণায় আত্মসমাহিত ছিলেন।

তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, কুরআন ও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত মতবাদের মাঝে কোন বিরোধ নেই। বিরোধ আছে বাইবেল ও বিজ্ঞানের মাঝে।

তার এই সুদীর্ঘ গবেষণার ফলে তিনি 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' নামে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করলেন, যা গোটা পশ্চিমা বিশ্বে গুঞ্জন সৃষ্টি করে ফেলেছিল। প্রথম প্রকাশেই যার সব কপি নিঃশেষিত হযে যায়। আরবি, ইংলিশ,ইন্দোনেশিয়ান, ফার্সি, তুর্কি, উর্দু, গুজরাটি ও জার্মানভাষাসহ বিশ্বের অনেক ভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে।

অনেক ইহুদি খ্রিস্টান বইটির জবাব লেখে। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ ও বিফল হয়ে দেখা দেয়। এদের একজন হলো ড. উয়িলিয়াম কিম্পবল সে 'কোরআন এবং বাইবেলঃ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোকে' (the qur'an and the bible in the light of history and science) নামে বইটির একটা জবাব লেখে।[৪৭]

---

[47] https://youtu.be/Mc6mpDyoozI?t=276

ইনশাআল্লাহ অচিরেই আসছে!

সত্যের জয় হলো (২)

ইলিয়াছ রিফায়ী

আল ইসলাম প্রকাশনী (দারুল ইসলাম)

কয়েকটি আলোচ্য বিষয় হল,

- চাঁদ দু'টুকরো হলো
- লোহা: মহাকাশে যার জন্ম
- পৃথিবীর ছাদ
- 'আর আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করেছি পানি'
- বির্য তৈরির স্থান নির্ধারণে কুরআনে কি ভুল আছে? ইত্যাদি